বহ্ন্যুৎসব

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

সুহৃদ্বরেষু

জগদানন্দপুরের মধ্য-ইংরাজি স্কুলটি কূর্ম্মগতিতে বছর দশেক চ'লে এখন একেবারে থমকে দাঁড়িয়েছে। গ্রামের লোকের মনে সংশয় নেই যে, স্কুলের অন্তিম ঘনিয়ে এসেছে। অথচ এ রকম হওয়া অন্যায়।

গ্রামটি নিতান্ত ছোট নয়। অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোকের বাস। তাঁদের অনেকেই ক'লকাতায় ভালো চাকুরী করেন। বাবু-নামে পরিচিত মুখুজ্যেরা অবস্থাপন্ন জমিদার। সম্প্রতি হয় তো কিছু ঋণগ্রস্ত, তবু একটা মাইনর স্কুল চালাবার মতো সঙ্গতি এখনও তাঁদের আছে। তথাপি স্কুলটির এই অবস্থা।

জমিদার গ্রামে বড় একটা থাকেন না, ক'লকাতাতেই থাকেন। সম্প্রতি 'ইভ্যাকুয়েশনে'র হিড়িকে দেশে এসেছেন। স্কুলের সভাপতি বড় ভাই দর্পনারায়ণ, সেক্রেটারী হর্ষনারায়ণ। কিন্তু তাঁদের অনুপস্থিতিতে নায়েব কন্দর্প রায়ই একাধারে সভাপতি ও সেক্রেটারী। এক কথায় তিনিই স্কুলের সর্ব্বময় কর্ত্তা।

মুখুজ্যেরা সপরিবারে গ্রামে আসার কয়েকদিন পরে স্কুলের হেডমাষ্টার দাশরথি ভঞ্জ তাঁর অন্যান্য সহকর্ম্মীদের নিয়ে একদা প্রাতঃকালে বাবুদের বাড়ীতে উপস্থিত হলেন।

হর্ষনারায়ণ তখন বৈঠকখানার সামনের খোলা জায়গায় একটা টেনিস লন করার বন্দোবস্ত করছিলেন। বয়স তাঁর বছর ত্রিশের মধ্যে। গৌরকান্তি সুদর্শন পুরুষ। পরণে শার্ট ও শর্ট। শরীরে বাঁধুনি আছে। মেজাজ একটু সাহেবী ধরণের।

শিক্ষকেরা নমস্কার ক'রে তাঁর কাছে দাঁড়াতেই তিনি বাঁ হাত দিয়ে সোজা বড়বাবুর ঘরটা দেখিয়ে দিলেন।

বললেন, আমার কাছে কেন? বড়বাবু আপিস-ঘরে রয়েছেন।

ছোটবাবু যাকে আফিস-ঘর বলেন বড়বাবু তাকে বলেন কাছারী। একখানা বড় হল-ঘরের একদিকে নীচু তক্তাপোষের উপর লম্বা ফরাস বিছানো। সেইখানে একটা মোটা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে দর্পনারায়ণবাবু গড়গড়া টানেন। তাঁর নিতান্ত অনুগত ব্রাহ্মণ বন্ধুবান্ধবেরা সেইখানেই বসেন। সামনে মেঝের উপর প্রশস্ত শতরঞ্চে অন্যান্যেরা বসে। আরও নিম্নপদস্থ যারা তারা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। তাস-পাশা খেলা থেকে আরম্ভ ক'রে জমিদারী-সংক্রান্ত কাজকর্ম্ম দেখা—সবই এই ঘরে বসেই সম্পন্ন হয়।

কি চেহারায়, কি প্রকৃতিতে দুটি ভাই সম্পূর্ণ বিপরীতধর্ম্মী। দর্পনারায়ণ ছোট ভায়ের মতো অতটা ফর্সা নন। তাঁর চেয়ে মাথাতেও কিছু ছোট। দেহ স্থূল এবং মেজাজ সাহেবী নয়, মধ্যযুগীয় জমিদারের মতো। বয়স পঁয়তাল্লিশ উত্তীর্ণ হয়েছে। পোষাক—কোঁচানো থান-ধুতি ও মেরজাই। ক্রমাগত তাম্রকূট-সেবনের ফলে মুখের কাঁচা পাকা গোঁফে তামাটে রং ধরেছে।

দাশরথি ভঞ্জ সদলবলে সবিনয়ে প্রণাম ক'রে সেইখানে এসে দাঁড়ালেন।

দর্পনারায়ণ গড়গড়া থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার ?

মুখপাত্র-হিসাবে দাশরথি বললেন, আমরা মাইনর স্কুলের শিক্ষক। আপনি এসেছেন শুনে প্রণাম করতে এলাম। আমার নাম···

বাধা দিয়ে দর্পনারায়ণ বললেন, নাম বলতে হবে না বাপু। নাম আমি সকলেরই জানি। তোমরা তো আমার অচেনা নও। বোসো, বোসো। তার পরে ? স্কুল চলছে কেমন ?

—আজ্ঞে কই আর চলছে ? তবে এবারে হুজুর এসেছেন। ব্যবস্থা একটা হবেই। তাই এঁদের বলছিলাম, ছ-সাত মাস মাইনে বাকি, সে এমন কিছু নয়, এখন স্কুলটা যাতে চলে ··

দর্পনারায়ণ সবিস্ময়ে বললেন, বল কি হে! ছ-সাত মাস মাইনে বাকি ?

দাশরথি নিরীহভাবে বললেন, আজ্ঞে, বোধ করি কিছু বেশিই হবে। কিন্তু সে জন্যে ভাবছি না। আপনি যখন আছেন, তখন টাকা মারা যাবে না। এখন কথা হচ্ছে···

দর্পনারায়ণ চিন্তিতভাবে বললেন, সামান্য মাইনে পাও। তাও সাত মাসের উপর বাকি বলছ। আমি ভাবছি, তোমরা আছ কি ক'রে ?

দাশরথি বলতে যাচ্ছিলেন, না থাকলে যাব কোথায় ? বাজার তো জানেন ?

কিন্তু সে কথা বললেন না।

বললেন, না থেকে করি কি বলুন ? চারিদিকে দু'ক্রোশের মধ্যে এই একটি স্কুল। এটি যদি উঠে যায়, তা হ'লে দুগ্ধপোষ্য ছেলেদের কি দুর্গতি হবে বিবেচনা করুন।

—গ্রামের লোকে সে কথা বোঝে ?

—আজ্ঞে, বুঝবে না কেন ?

দর্পনারায়ণ বিরক্তভাবে বললেন, বোঝে যদি তো স্কুলটা রাখবার চেষ্টা করে না কেন ?

তার একটা কারণ আছে। গ্রামের লোক দেবে টাকা, আর কর্ত্তা হবে জমিদারের বেনামে কন্দর্প রায়, এটা গ্রামের লোক পছন্দ করে না।

বুদ্ধিমান দাশরথি কিন্তু সেদিক দিয়ে গেলেন না। বললেন, আজ্ঞে, জানেনেই তো, গরীব।

দর্পনারায়ণ এবার সোজা হয়ে উঠে বসলেন।

বললেন, দেখ দাশরথি, তোমার স্কুলে আমাদের বাড়ীর কোনো ছেলে পড়ে ? কখনও পড়বে বলে আশা কর ?

—আজ্ঞে, কি দুঃখে পড়বে ? কলকাতায়…

—তবেই বোঝ, স্কুলের জন্যে আমরা যে টাকা ঢেলেছি তা প্রজাদের ছেলেদের জন্যেই। কিন্তু প্রজারা তো আর জমিদারকে মানতে চায় না। তারা তো সাবালক হয়েছে। তবে জমিদার তাদের জন্যে আর কেন খরচ করবে ?

কথাটার মধ্যে একটু অতিরঞ্জন আছে। প্রজার কল্যাণ মিথ্যা নয়। কিন্তু এই উপলক্ষে দর্পনারায়ণও "রায সাহেব" হয়েছেন।

দাশরথি এ প্রসঙ্গও উত্থাপন করলেন না। তিনি প্রসন্নহাস্যে কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু দর্পনারায়ণ তাঁকে থামিয়ে দিলেন।

বললেন, না না, দাশরথি, এ বিষয়ে তুমি আর আমাকে একটি কথাও বোলো না। আমরা অনেক ভেবে স্থির করেছি, স্কুলের জন্যে জমিদারের পক্ষ থেকে আর একটি পয়সাও ব্যয় করা হবে না।

এই রকম স্থির করার পিছনে একটা ইতিহাস আছে। কন্দপ

রায়ের একটি আত্মীয় সম্প্রতি আই-এ পাশ করে বাড়ীতে বেকার বসে আছে। কন্দর্পের ইচ্ছা দাশরথিকে সরিয়ে সেইখানে তাকে বসানো। অথচ দাশরথি গ্রামের লোক। তাঁকে হঠাৎ তাড়ানোও সহজ নয়। স্কুল থেকে মাইনে পাওয়ার আর আশা নেই জেনে যদি তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন, তা হলেই কাজটি সহজ হয়।

সেই উদ্দেশ্যেই কন্দর্প চাল চালছে। অবশ্য দর্পনারায়ণ তা জানেন না। কিন্তু দাশরথি তা অনুমান করেছেন। সেই জন্যেই সাত-আট মাস মাইনে না পেয়েও তিনি নিজে চাকরী ছাড়েননি, অন্যদেরও ছাড়তে দেননি।

কিন্তু জমিদারদের কথায় এবং দৃঢ়তায় এবারে দাশরথি চিন্তিত হলেন। নিজেদের মধ্যে গোপনে তাঁরা পরামর্শ করলেন, তাঁরা স্কুল একেবারে উঠিয়ে দিয়ে যাবেন, তবু কন্দর্প রায়ের আত্মীয়ের পথ প্রশস্ত করবার জন্যে পদত্যাগ করবেন না। একেবার স্কুল উঠে গেলে আবার নতুন ক'রে স্কুল করা সহজ হবে না। কিন্তু তার আগে স্কুলটিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে একবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে তাঁরা সদলবলে আর একবার গ্রামে বার হলেন।

সেদিনটা রবিবার।

আগে গ্রামের যাঁরা বছরেও একবার আসতেন না, ইভ্যাকুয়েশনের জন্যে মেয়েছেলে গ্রামে পাঠাতে হওয়ায় তাঁদের অনেকেই এখন কেউ মাসে একবার, কেউ পক্ষান্তে একবার, কেউ কেউ বা সপ্তাহে একবার করেও আসছেন। সুতরাং এখন রবিবারে গ্রাম জমজমাট হয়।

যারা কলকাতায় থেকে স্কুল কলেজে পড়ত, তারা গ্রামে এসে নিত্য-নূতন উপদ্রব আরম্ভ করেছে। আজ পাঁচ জনে জুটে জঙ্গল পরিষ্কার করছে, কাল ডোবা বন্ধ করছে, পরের দিন হয় তো বা রাস্তা সংস্কার করছে। এরা অল্পবয়স্ক বালক। রাজধানী থেকে এরা নিয়ে এসেছে জীবনযাত্রার বিচিত্র ধারণা। গ্রামের শিক্ষিত লোকেরা এদের ছেলেমানুষিতে হাসে, অশিক্ষিতেরা কৌতূক বোধ করে।

দাশরথি স্থির করলেন, এদের স্কুল সম্বন্ধে উৎসাহিত করতে পারলে অনেক সুবিধা হয়।

ছেলেরা অমনিতেই সহজ-দাহ্য পদার্থ। সুতরাং উৎসাহের আগুন জ্বলতে এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হ'ল না। তারা চাঁদার খাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

সে একটা নূতন উপদ্রব!

এতদিন যা-কিছু তারা করছিল তাতে বাইরের লোকের ডাক পড়েনি। অবসর-সময়ে কেউ বা তাদের কাজ দেখতে আসতো, কেউ আসতো না। কিন্তু এবারে যে তারা লোকের ট্যাঁকে হাত বাড়ায়!

লোকেরা বিব্রত হয়ে উঠলো। চাঁদার খাতা হাতে ছেলেদের দেখলেই তারা স'রে পড়ে।

কিন্তু যে বিশেষ রবিবারের কথা বলছি, সেদিনে একটা বিশেষ ঘটনা ঘটলো :

দামোদর হালদার এ গ্রামের একজন বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তি। কলিকাতায় সুপারির ব্যবসা ক'রে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। লোকটি

নিতান্ত সামান্য অবস্থা থেকে বড়লোক হয়েছেন। ছেলেবেলা লেখাপড়া শেখার কোনো সুযোগ পাননি।

ছেলেরা তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াইতেই তিনি স্কুল-সম্বন্ধে সমস্ত কথা জেনে নিলেন এবং দাশরথিকে ডেকে পাঠালেন।

বললেন, দেখ্ দাশরথি, তোমার স্কুলের জন্যে যে টাকাটার অভাব পড়ে, সে আমিই দোব। পনেরো দিন ঘুরে ছেলেরা চাঁদা আদায় করেছে মোটে দু'টাকা ছ'আনা। ওসব বন্ধ করো।

চাঁদার পরিমাণে দাশরথি ক্রমেই স্কুল-সম্বন্ধে আশা বিসর্জ্জন দিচ্ছিলেন। দামোদরের কথা শুনে তিনি আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন!

বললেন, তোমার জয় হোক ভাই! তা যদি তুমি কর, গ্রামে চিরকাল তোমার নাম থেকে যাবে।

দামোদর বললেন, আমার নামের জন্যে ব্যস্ত নই ভাই। কিন্তু ইচ্ছা আছে স্কুলটা যদি আমার হাতেই দাও, ওর নামটা পালটে দোব। ওর সঙ্গে আমার বাবার নাম জুড়তে হবে।

দাশরথি চিন্তিত হ'লেন।

বললেন, সে তো অনেক হাঙ্গামা। নর্টন সাহেব ছিলেন জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট। তাঁর নামে স্কুলটা ক'রে বড়বাবু 'রায় সাহেব' উপাধি পেলেন। সে-নাম বদলে অন্য নাম রাখতে গেলে গবর্ণমেণ্টও তো চটতে পারেন।

দামোদর ব্যবসাদার লোক।

বললেন, সে আমি জানি নে ভাই। আমি মাসে একশো টাকা ক'রে দোব। আর একটা দালান বাড়ী ক'রে দোব। টেবিল-চেয়ার আসবাবপত্র যা দরকার তাও দোব। কিন্তু স্কুলের নাম হবে 'স্বরূপ

মধ্য-ইংরাজি বিদ্যালয়'। জমিদার কিম্বা নায়েবের সঙ্গে তার কোনো সংস্রব থাকবে না। গ্রামের পাঁচজনকে নিয়ে কমিটি হবে।

প্রস্তাবটি লোভনীয়। কিন্তু সহজ নয়।

দাশরথি তখনই কোনো জবাব দিতে পারলেন না।

বললেন, গ্রামের পাঁচজনকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি। তার পরে তোমাকে জানাবো, কি হয়।

গ্রামের লোকে সাগ্রহে প্রস্তাবটিতে সম্মতি দিলে।

জমিদারের কাছ থেকে স্কুলের জন্যে যে একটি পয়সাও পাওয়া যাবে না—সে তারা বুঝেছে। জমিদারকে তারা চেনে। তাদের নিজেদেরও টাকা দেবার সঙ্গতি যদি বা কারো কারো থাকে, ইচ্ছা নেই। অথচ স্কুলটা রাখাও নিতান্ত প্রয়োজন। নইলে ছেলেদের পড়াশুনোর খুবই অসুবিধা হবে। অনেক ছেলের পড়া বন্ধই হয়ে যাবে। এর ওপর ছেলেদের হাতে চাঁদার খাতা তাদের কাছে দুঃস্বপ্নের মতো হয়ে উঠেছে।

এমন অবস্থায় দামোদর হালদার, কাঁচা টাকা যার হাতে প্রচুর জমেছে, যদি স্বেচ্ছায় সমস্ত ভার বহন করতে সম্মত হয়, এই দুর্দ্দিনে তার চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কি করতে পারে ?

উৎসাহ সকলের চেয়ে বেশী ছেলেদের।

তারা নিজেরাই গ্রামে ঢোল দিলে। দীঘির ঘাটে বটগাছের নীচে বেঞ্চি, টেবিল, চেয়ার সাজিয়ে সভা করলে। লোক কতক এলো, কতক দূরে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা নিরীক্ষণ করতে লাগলো, কতক বা জমিদারের অপ্রীতিভাজন হওয়ার ভয়ে এলোই না।

তথাপি সভা হ'ল।

জমিদারের ভয় করে না, এমন লোকের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। তারাই সভা করলে। অনেক চিন্তার পর স্থির হ'ল, পুরাণো স্কুল যেমন আছে তেমনি থাকবে। জমিদারই কার্য্যতঃ তার মালিক। 'নর্টন মিড্‌ল ইংলিশ স্কুলে'র সঙ্গে সদাশয় নর্টন সাহেবের পুণ্যস্মৃতি-রক্ষার দায়িত্ব জমিদারেরই। তিনি ইচ্ছা করলে সে স্মৃতি রাখতে পারেন, নাও রাখতে পারেন। সে সম্বন্ধে কোনো বিদ্বেষভাব পোষণ না করেই স্বকুমারমতি বালকদের শিক্ষার প্রয়োজনে নতুন একটি স্কুল খোলা হবে, যার নাম হবে 'স্বরূপ মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়'। তার সভাপতি হবেন দামোদর হালদার। সেক্রেটারী অভিরাম মজুমদার। একটি ম্যানেজিং কমিটিও সেই সভায় গঠিত হ'ল।

আশ্চর্য্যের বিষয়, জমিদার-পক্ষ থেকে এ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র আপত্তিও উত্থাপিত হ'ল না। তাঁরা নিজেরা সভায় আসবেন, এ অবশ্য কেউ প্রত্যাশা করে না। কিন্তু তাঁদের কর্ম্মচারীদের কেউ, অথবা অনুগত জনেরাও প্রস্তাবটির পক্ষে অথবা বিপক্ষে একটি কথাও কইলেন না। এই ব্যাপারটা আসলে তাঁরা প্রকাশ্য অথবা পরোক্ষভাবে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলেন না। তাঁরা তাঁদের মহিমান্বিত উচ্চতায় নির্ব্বিকারভাবে দূরে রইলেন।

দৃশ্যতঃ বিষয়টি খুব সহজ বলেই বোধ হয়। ছেলেরা একে এইভাবেই গ্রহণ করলে। কিন্তু জমিদারের সঙ্গে কারবার ক'রে যারা ভূয়োদর্শিতা লাভ করেছে, নায়েব কন্দর্প রায়কে যারা জানে, তারা এই নির্ব্বিকার ভাবকে কালবৈশাখীর পূর্ব্বেকার টুকরো মেঘের উদাসীনতা বলেই গ্রহণ ক'রে মনে মনে ভয় পেলে। এমন কি দাশরথি নিজেও।

কথা হ'ল, গ্রামের উত্তর প্রান্তে দামোদরদের যে পোড়ো জমিটা আছে, সেইখানে আপাততঃ মাটির একটা বাড়ী হবে স্কুলের জন্যে। বৈশাখের মধ্যেই তা সম্পূর্ণ হবে। তখন থেকে সেইখানে স্কুল বসবে। ইতিমধ্যে দামোদরের বাড়ীর বাইরের দিককার ঘরগুলোয় স্কুল চলবে। যুদ্ধ না থামলে দালান হওয়া অসম্ভব।

চেয়ার, বেঞ্চ, বোর্ড, ম্যাপ প্রভৃতির জন্যে দামোদর সেই সভাতেই কমিটির হাতে তিন শত টাকা দিয়ে দিলেন।

স্থির হ'ল, ছেলেরা অবিলম্বে ট্রান্সফার নিয়ে নতুন স্কুলে ভর্ত্তি হবে। তারা চলে আসার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকেরা একে একে পদত্যাগ ক'রে নতুন স্কুলে যোগ দেবেন। ট্রান্সফার নেওয়া শেষ হয়ে গেলে দাশরথি সব শেষে নিজে আসবেন।

দামোদরের বাইরের দিককার ঘরগুলোয় স্কুল বসে গেল। পোড়ো জায়গায় তাড়াতাড়ি বাড়ী উঠতে লাগলো। দামোদরের টাকার অভাব নেই।

কিন্তু ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝিও নর্টন স্কুল থেকে অর্দ্ধেকের বেশি ছেলে এল না। মাষ্টারও কয়েক জন মাত্র এলেন; সবাই দেখে আশ্চর্য্য হ'ল, দাশরথি শেষ পর্য্যন্ত নর্টনেই রয়ে গেলেন।

দামোদর তাতে দমলেন না। তাঁর টাকা আছে। স্কুলের জন্যে বাইরে থেকে তিনি একজন বি-এ পাশ প্রবীণ হেডমাষ্টার নিয়ে এলেন। আরও কয়েক জন বাছাই-করা শিক্ষকও আনা হ'ল।

এমনি ক'রে দুটি স্কুলই চলে। 'নর্টন' চলে প্রাচীন আভিজাত্যের

সঙ্গে নিঃশব্দে, 'স্বরূপ' নবীন ধনশালিতায় সশব্দে। সে শব্দ ওঠে ছেলেদের মহল থেকেই।

অবশেষে চৈত্রের শেষে 'স্বরূপে'র বাড়ী শেষ হ'ল। সামনে খোলা মাঠ। একপ্রান্তে তিনদিকে তিনখানি প্রশস্ত গৃহ। মেজেয় সিমেণ্ট ঝকমক করছে। স্থির হয়েছে অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে গৃহ-প্রবেশ হবে। অনেক চেষ্টায় ও অর্থব্যয়ে মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেটকে সভাপতি হ'তে সম্মত করা হয়েছে।

কলকাতা থেকে দামোদর এনেছে কত রকমের খাবার, ফুলের তোড়া, মালা। আগের দিন অপরাহ্ণেই স্কুল-প্রাঙ্গণে মূল্যবান প্রশস্ত সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। এত বড় সমারোহ এ অঞ্চলে বড় একটা হয় না।

অকস্মাৎ বিপর্য্যয় কাণ্ড!

দুপুর রাত্রে চীৎকার উঠলো, আগুন! আগুন!

বৈশাখের রাত্রি।

পুকুর শুকনো, কোথাও একফোঁটা জল নেই।

গ্রামের লোক ছুটলো বটে, কিন্তু 'স্বরূপ মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়ে'র বাড়ী, উৎসব-মণ্ডপের সামিয়ানা, বিদ্যালয়ের আসবাব কিছুই রক্ষা হ'ল না। দেখতে দেখতে সমস্ত পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট কন্দর্প রায়ের রিপোর্ট গেল, এ কংগ্রেসীদের কাজ।

দামোদর 'ওয়ার ফণ্ডে' হাজার টাকা দিয়েছেন। স্কুলের দ্বারোদ্ঘাটন করেছেন এস-ডি-ও। এমন অবস্থায় অগ্নিকাণ্ডের আর কি অর্থ হ'তে পারে?

খবরের কাগজেও 'বাঙ্গলার নানাস্থানে বিক্ষোভ'-স্তম্ভে খবরটা বড় বড় করে বেরুল। সুখের বিষয়, কাকেও গ্রেপ্তার করা হ'ল না।

'স্বরূপ মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়ে'র এইখানেই পরিসমাপ্তি ঘটলো।

এর মাস কয়েক পরে দাশরথি একদিন সকাল-সকাল স্কুলে এসে দেখেন—স্কুলে নতুন তালা ঝুলছে।

ছুটলেন তিনি কন্দর্প রায়ের কাছে। কন্দর্প রায় মিষ্টি হেসে বললেন, বাবু হুকুম পাঠিয়েছেন স্কুল বন্ধ ক'রে দিতে। কি করি বলুন, কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম! বাবু আগের মাসেই সপরিবারে ক'লকাতায় গেছেন।

দাশরথি চক্ষে অন্ধকার দেখলেন। তাঁর প্রায় বছরখানেকের মাইনে বাকি।

তৃতীয় পক্ষ

দ্বিতীয়া পত্নীর বিয়োগের পর রামহরি কয়েকটা দিন মুহ্যমান হয়ে রইল।

কিন্তু ওই কয়েকটা দিনই মাত্র। জেলা বোর্ডের সাব-ওভার-সিয়ারের তার বেশী শোক করার সময় নেই। গুড় সহযোগে খানকয়েক বাসি রুটি এবং এক পেয়ালা চা—এই খেয়ে রামহরি বাইসিকেল নিয়ে সকাল সাতটার আগেই বেরিয়ে যায়। জেলা বোর্ড থেকে কোথায় রাস্তা মেরামত হচ্ছে, কোথায় পুল তৈরী হচ্চে, কোথায় পুকুর খোঁড়া হচ্ছে, সে সমস্ত তদারক ক'রে যখন সে ফেরে তখন কোনোদিন বারোটা, কোনো-দিন বা একটা। তারপরে স্নানাহার করে একটুখানি নিদ্রা দিয়ে আবার তিনটের সময় বেরিয়ে পড়ে। এবারে আর রাস্তা তদারকে নয়, আফিসে। তারপরে সন্ধ্যার আগে আফিস থেকে বাসায় ফিরে একটু জলযোগ ক'রে দত্তদের আড্ডায় তাস খেলতে যায়। ফিরতে রাত্রি এগারোটা-বারোটা।

এই তার কাজ।

মফঃস্বল শহরে এই আষ্টেপৃষ্ঠেনীর মধ্যে এবং এই চাকুরীতে বেশী দিন শোক করার অবসর কোথায়?

তারপরে রামহরির বয়স হয়েছে পঞ্চাশের কাছাকাছি। ঘরে অনেক-গুলি ছেলেমেয়ে। প্রথম পক্ষের তিনটি—বড়টি মেয়ে। বছর কুড়ি তার বয়েস। বছর চারেক আগে অনেক সমারোহ ক'রে রামহরি তার বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু দু'বছরের মধ্যে সিঁথির সিন্দূর, হাতের শাঁখা

খুইয়ে অভাগিনী অমলা বাপের বাড়ী ফিরে এল! সেই থেকে সে বাপের বাড়ীতেই আছে।

অমলার পরে যেটি—সুরেন, সে এবার ম্যাট্রিক দেবে। তার পরেরটি আরও নীচে পড়ে।

দ্বিতীয় পক্ষের ছুটি মাত্র ছেলে। বড়টি স্কুলে পড়ে! ছোটটি বছর পাঁচেকের মাত্র।

এই নিয়ে রামহরির সংসার।

রামহরি লোকটি আসলে মন্দ নয়। কিন্তু কুলি ঠেঙ্গিয়ে ঠেঙ্গিয়ে বাইরেটা একেবারে কাঠখোট্টা। বেশী কথা সে বলতে পারে না, যেটুকু বলে তাও গুছিয়ে নয়। তার চেহারাও ঠিক এরই সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেছে: মাথায় প্রশস্ত টাক, মুখে ঝাঁটার মতো এক গোছা গোঁপ। কাজের চাপে দাড়ি কামানোর সময় ক্বচিৎ মেলে। সুতরাং সপ্তাহে অন্ততঃ পাঁচটা দিন খোঁচা-খোঁচা পাকা-পাকা দাড়িতে মুখমণ্ডল সমাকীর্ণ থাকে। বাইরে ক্রমাগত ঘোরাঘুরি করার জন্যে শরীরে চর্বি জমার অবকাশ হয় না। শরীর দীর্ঘ এবং ক্ষীণ। গাল ভাঙ্গা।

দ্বিতীয়া স্ত্রী মারা যাবার পর অশৌচের ক'দিন তাকে কিছু কাতর এবং অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। শ্রাদ্ধশান্তি মিটে যাবার পরের দিনই আবার সে সকাল বেলায় বাইসিকেল নিয়ে বার হ'ল।

অমলা একটু অবাক হ'ল। কিন্তু সেই সঙ্গে একটু খুশীও হ'ল। তার নিজের মা যখন মারা যায়, তখন তার জ্ঞান হয়েছে। তখন রামহরির মুখের উপর শোকের যে ছাপ পড়েছিল, কিছু কিছু এখনও তার মনে পড়ে। সে সময় রামহরি লম্বা ছুটি নিয়ে দেশে চ'লে গিয়েছিল। সেই দীর্ঘ অবকাশকাল এবং তারপরে কাজে যোগ দিয়েও রামহরি চুল দাড়ি

সম্বন্ধে অমনোযোগী হয়ে উঠেছিল। মাথায় তেল দিত না, মাছ মাংস খেত না এবং তাসের আড্ডার আকর্ষণ ত্যাগ করে স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনে যাতায়াত আরম্ভ করেছিল।

এক বছরের উর্দ্ধকাল এমনি চলেছিল। তারপরে মায়ের কান্নায়, আত্মীয়-স্বজনের অনুরোধে এবং বন্ধু-বান্ধবের জেদাজেদিতে অবশেষে বাধ্য হয়েই সে বিবাহ করে।

অমলার বয়স তখন ন' বছর হয়েছে, কি হয়নি। কিন্তু এ সকল বিষয়ে স্ত্রীসুলভ স্বাভাবিক প্রাখর্য্যের জন্যেই হোক, অথবা যে কারণেই হোক, সে সব দিনের কথা আজও তার বেশ মনে পড়ে।

রামহরির গার্হস্থ্য জীবনে ফিরিয়ে আনতে সেবারে অতগুলি লোকের এক বছরেরও বেশী সময় লেগেছিল। আব এবাবে দশটি দিন কাটতে-না-কাটতেই রামহরি অত্যন্ত সহজভাবেই নিজের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায ফিরে এল!

অমলার একটু বিস্ময় লাগে, তবু ভালোই লাগে। মনে মনে তার আনন্দ হয় এই ভেবে যে, রামহরি তার মাকে যেমন ভালোবেসেছিল, এমন আর কাকেও নয়। পুরুষ মানুষ বেশীদিন নারীহীন থাকে না। কিন্তু তাই ব'লে সুদূর অতীত কালের রামহরির ভালোবাসার সেই সব প্রকাশকে কিছুই নয় ব'লে সে উড়িয়ে দেবে কি ক'রে?

নিজের মায়ের কথা মনে ক'রে অমলা বেশ গর্ব্ব অনুভব করলে।

আরও মাস তিনেক কেটে গেল।

নিজের মায়ের সব কথা অমলার ভালো মনে পড়ে না রামহরির

শোবার ঘরে তার মায়ের একটা বড় অয়েলপেন্টিং আছে। তার থেকে এই পর্য্যন্ত তার মনে পড়ে যে, সে মা ছিল ছোট-খাটো শ্যামবর্ণের একটি মেয়ে। চঞ্চল এবং চটপটে। চোখ থেকে সব সময় যেন কৌতুক ছিটকে পড়ত! মুখে সব সময় হাসি আর ছড়া।

কিন্তু এ মা ছিল উলটো। লম্বা, ফর্সা চেহারা। চোখের দৃষ্টি শান্ত। একে কখনও সে জোরে হাসতে শোনেনি, রেগে চীৎকার করতে শোনেনি, অভিমানে কাঁদতে দেখেনি। কোথাও যেন তার বাড়াবাড়ি ছিল না।

তার বেশ মনে পড়ে, রামহরি যেদিন ওকে নিয়ে এল তার পরের দিন সকালে সে চুপ করে দরজার পাশে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বিয়েবাড়ীর কর্ম্ম-কোলাহলের দিকে চেয়ে কি যেন তার মনে হাচ্ছল। কিন্তু সে বয়সে কিছুতেই সে বুঝতে পারছিল না, কি তার মনে হচ্ছিল। হঠাৎ কোথা থেকে তার নতুন মা বেরিয়ে এসে তার সামনে দাঁড়ালো।

বললে, স্নান করোনি তুমি?

ও বললে, না।

—চলো তোমায় স্নান করিয়ে আনি।

তারপরে ওকে সাবান মাখিয়ে স্নান করিয়ে দিলে, ঘরে নিয়ে এসে স্নো-পাউডার মাখিয়ে দিলে, কপালে দুটি ভ্রূর মাঝখানে একটা সিন্দুরের টিপ পরিয়ে দিলে, যে বাক্সয় ওর জামা থাকে, সে বাক্স থেকে জামা বের করে পরিয়ে দিলে।

বললে, এইবার খেলা করগে যাও।

সেদিন থেকে গত দশ বৎসরের মধ্যে অমলা তার নতুন মাযের বিরুদ্ধে

অভিযোগ করবার একটা কথাও খুঁজে পায়নি। সেই কথা স্মরণ করে তার নিজের মায়ের জন্যে গর্ব্ব করতে গিয়ে অমলা মনে মনে একটু লজ্জাই পেলে। স্থির করলে, যেখানে তার নিজের মায়ের অয়েলপেণ্টিং টাঙানো আছে, তার পাশেই তার নতুন মায়েরও একটা অয়েলপেণ্টিং টাঙিয়ে রাখা উচিত।

কিন্তু সে কথা তার বাবাকে বলতে লজ্জা করে। সে স্থির করলে, আসছে মাসে তার বাবার কাছ থেকে সংসার খরচের জন্যে যে-টাকা পাবে তাই থেকে সে নিজেই একটা অয়েলপেণ্টিং করিয়ে নেবে। নিতান্তই যদি বেশী খরচ পড়ে তাহ'লে টাকাটা দু'তিন মাসে অল্প অল্প করেই দেবে।

ক'দিনেই অমলা বুঝতে পারলে, তার নতুন মা এই সংসারে কি খাটুনীই না খাটতো। একটা ঠিকা ঝি আছে। সে বাসন ক'খানা মেজে দেয়, মসলাটা পিষে দেয়, আর বালতি দুই জল তুলে দেয়। বাকি সমস্ত কাজ একা নতুন মা করত। কোনোদিন তাকে কুটোখানা ভেঙে দুটো করতে হয়নি।

সে কি সহজ কাজ!

রান্না দু'প্রস্ত। এক প্রস্ত ছেলেদের স্কুলের, আর এক প্রস্ত সকলের। এর উপর ঘর পরিষ্কার থেকে আরম্ভ ক'রে ছেলেদের নাওয়ানো-খাওয়ানো, বিছানা তোলা, বিছানা পাতা, পান তৈরী থেকে রামহরির তামাক সাজা পর্য্যন্ত সবই আছে। এ সমস্তটুকুই তার নিজের হাতে করা চাই।

অমলার ভয় হ'ল, এত কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব হবে কি? নতুন

মার মতন অমন পরিপাটি করে কাজ কি সে করতে পারবে? নতুন মার হাতের রান্না যে খেয়েছে, সে আর ভুলতে পারেনি। তেমনি ক'রে সে কি রাঁধতে পারবে? কোনোদিন তাকে নতুন মা কোনো কাজ করতে দেয়নি। সে নিজেও যেচে কখনও কোনো কাজ করেনি। শুধু বসে বসে শেলাই করেছে, আর নভেল পড়েছে। এখন একসঙ্গে এত কাজের চাপ সে সামলাবে কি ক'রে?

—বড়দি, রান্না হ'ল? দশটা বেজে গেছে।

অমলা রান্নাঘরে হাতা নিয়ে খটর খটর করে। সকাতরে বলে, আর দু'মিনিট দাঁড়া না ভাই। তরকারিটা নামিয়েই তোদের জন্যে গরম গরম মাছ ভেজে দিচ্ছি।

রোজ লেট হচ্ছি বড়দি। আজকে যদি লেট হই নির্ঘাৎ বেঞ্চের উপর স্যার দাঁড় করিয়ে দেবে।

কথাটা সত্যি। অমলা রান্না ঘরে ব্যস্তভাবে ছুটোছুটি করতে পারে, কিন্তু ওদের লেট বাঁচাতে পারে না। রোজই ওরা লেট হয়, রোজই স্কুলের সময় অভিযোগ করে। কোনোদিন হয়তো শুধু দই দিয়ে দু'টি ভাত খেয়ে স্কুলে যায়। অথবা রোজই চেষ্টা করে যাতে ওদের দেরী না হয়। রোজই আরও সকালে ওঠে। তবু দেরী হয় এবং কি ক'রে যে দেরী হয় কিছুই বুঝতে পারে না।

কেবল অভিযোগ আসে না রামহরির কাছ থেকে। রামহরি যথা-নিয়মে কাজ তদারক ক'রে ফেরে। স্নান ক'রে আহারে বসে। অমলা সামনে বসে খাওয়ায়। কিন্তু বাবার মুখ দেখে বুঝতেই পারে না, রান্না কেমন হয়েছে, খেতে তার কোনো কষ্ট হচ্ছে কি না। অথচ মুখ ফুটে সে-কথা জিগ্যেস করতেও তার সাহস হয় না। মাঝে মাঝে নতুন মা'র

মতো দু'একটা নতুন রান্না সে রাঁধতে চেষ্টা করে। রামহরি কখনও খায়, কখনও খায় না। অমলা বুঝতে পারে না, সে রান্না রামহরির ভালো লাগে কিনা।

মোট কথা, তিন মাসের মধ্যেই অমলার চেহারা শুকিয়ে আধখানা হয়ে গেল। ভোর পাঁচটায় সে ওঠে। রান্নাঘরের কাজ মিটতে আড়াইটে বেজে যায়। ফের সাড়ে তিনটেয় আবার কাজ সুরু হয়।

ছেলেরা দশটায় একরকম না খেয়েই স্কুল যায়। সবাই হাঁ হাঁ করতে করতে আসে। তখন আর তাদের দেরী সয় না। সুতরাং তারা সাড়ে চারটেয় ফেরবার আগেই অমলাকে তাদের খাবার তৈরী ক'রে রাখতে হয়। ওদের জল খাওয়া শেষ হ'লে আসে রামহরি। তিনি চা খেয়ে চলে গেলে রাত্রের রান্না চাপে। সেও দু'প্রস্ত। এক প্রস্ত ছেলেদের জন্যে, আর এক প্রস্ত রামহরির জন্যে। রামহরি তাস খেলে ফেরে বারোটা-একটায়। তখন তার জন্যে গরম-গরম লুচি ভেজে দিতে হয়।

এত পরিশ্রম অমলার সয় না। এত পরিশ্রমে সে অভ্যস্ত নয়। তার নতুন মা কখনও তাকে কোনো পরিশ্রমের কাজ করতে দেয়নি। শুধু কি তাই? তিন মাস ধরে অবিশ্রান্ত খেটে অমলার শরীর দিন দিন শুকিয়ে যাচ্চে। কিন্তু সেদিকে আজও কার চোখ পড়ল না,—রামহরিরও না। অথচ নতুন মা তার মাথা ধরলেও কি ক'রে যেন টের পেত।

নতুন মা'র কথা মনে ক'রে অমলার চোখে জল এল।

একদিন সকালে অমলার এমন হ'ল যে, মাথা তুলতে পারে না। তবু পড়ে থাকার উপায় নেই। একটু পরেই ছেলেদের স্কুল যাবার সময় হবে। তাকে উঠতেই হ'ল।

সেই শরীরেই সমস্ত দিন কাজ কর্ম্ম করলে। রাত্রি ন'টায় ছেলেদের খাইয়ে যখন শুইয়ে দিলে তখন তার শরীর যেন ভেঙ্গে পড়ছে। ভাবলে রামহরির আসতে তো রাত্রি একটা। ছেলেদের সঙ্গে একটু বরং জিরিয়ে নিয়ে তারপর উঠবে। ময়দা তো মাখাই রয়েছে। দু'খানা লুচি ভেজে দিতে আর কতক্ষণ! নীচে রামহরির গলার সাড়া পেলেই উঠে পড়বে।

কিন্তু নীচে নয় উপরেই রামহরির গলার সাড়া যখন পেলে তখন তার ওঠবার শক্তি নেই। একবার ওঠবার চেষ্টা করলে, পারলে না। শুধু তার জবাফুলের মতো টকটকে লাল চোখের কোণ বেয়ে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো।

রামহরি ভয় পেয়ে গেল। তাড়াতাড়ি ওর ললাটের উত্তাপ পরীক্ষা ক'রে থমকে গেল।

এ যে ভীষণ জ্বর! গা যেন পুড়ে যাচ্ছে।

রামহরির একটা বিশেষত্ব এই যে, সহজে সে ব্যস্ত হয় না। অথবা হলেও বাইরে থেকে তা বোঝা যায় না।

সে জামা খুলে ফেলেছিল, আবার গায়ে দিলে। ওঘর থেকে বড় ছেলে সুরেশকে ঘুম থেকে তুললে!

বললে, তোর দিদির খুব জ্বর। ওঘরে তার কাছে বসে মাথায় একটু জলপটি দে আমি আসছি।

আধ ঘণ্টা পরেই রামহরি ডাক্তার নিয়ে ফিরলো।

ডাক্তার টেম্পারেচার নিলেন, নাড়ী দেখলেন, বুক, জিভ পরীক্ষা

করলেন। বললেন, আজকে ওষুধ বিশেষ কিছু দেবো না। একটা alkali mixture দিচ্ছি। মনে হচ্ছে, ভোগাবে। এদিকে-ওদিকে দু' একটা টাইফয়েড হচ্ছে, দু' একটা বসন্তের কেসও পাওয়া যাচ্ছে। খুব সাবধানে রাখবেন।

ডাক্তার মিথ্যা অনুমান করেননি। দিন দশেক অমলাকে ভোগালে। তবে টাইফয়েডও নয়, বসন্তও নয়, এইটুকুই সুখের বিষয়।

রামহরি একটা ঠাকুর রাখলে।

অমলার আপত্তি করার উপায় ছিল না। শুধু বললে, আমি যে ক'দিন না সেরে উঠি থাক সে ক'দিনের জন্যে।

রামহরি হাসলে। বললে, ক'দিন! তোমার হার্ট মোটেই ভালো নয়। দু'টো মাসের আগে তোমার উনোনের ধারে যাওয়াই চলবে না। তারপরেও···

রামহরি চুপ ক'রে গেল।

বাবার কাছে এত কথা এক সঙ্গে সে জীবনে শোনেনি। কখনও কারও জন্যে তাকে উদ্বেগ প্রকাশ করতেও দেখেনি। রোগশয্যায় শুয়ে বাপের এই কথাগুলি তার ভারি ভালো লাগল।

বললে, দুটো মাস না ছাই! এই পূর্ণিমাটা কেটে যাক, তার পর···

একটু থেমে আবার বললে, হার্টে আমার কিচ্ছু হয়নি। ডাক্তারে অমন বলে। আপনি ভাববেন না।

রামহরি চুপ ক'রে রইল।

অমলা বললে, সুরেশ বলছিল, ঠাকুরের রান্না নাকি অতি বিশ্রী। সে নাকি মুখে দেওয়া যায় না। আপনার খেতে নিশ্চয় খুবই কষ্ট হচ্ছে।

রামহরি জবাব দিলে না। আস্তে আস্তে জামাটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

এর কয়েকদিন পরে রামহরি একদিন এসে বললে, আমি একটু বাইরে যাব অমলা। ফিরতে দু' তিন দিন দেরী হবে। সাবধানে থাকবে সব।

ভয়ের কোনো কারণ ছিল না। তবু তিন দিনের মধ্যে রামহরিকে না দেখে অমলা উদ্বেগ বোধ করছিল। বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন তার বড় একটা হয় না। হ'লেও এত দেরী হয় না। বিশেষ নতুন মা মারা যাবার পরে রামহরি একটা দিনও বাইরে কোথাও যায়নি।

সূর্য্যাস্তের আর দেরী নেই। একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। পাশের জাম গাছের জলে-ধোয়া চিকণ পাতায় পড়ন্ত সূর্য্যের আলো ঝিকমিক করছে।

অমলা এখন গায়ে অনেকটা বল পেয়েছে। ঠাকুরের জবাব দেবার মতো বল অবশ্য নয়। তবে ঠাকুরের চুরি অনেকটা কমাতে পেরেছে। তরকারীগুলো সেই কুটে দেয়। কোন্ তরকারী কতখানি হবে ব'লে দেয়। মাছ তার সামনে ঝি কুটে দেয়। অমলা ঠাকুরকে বুঝিয়ে দেয়, কাকে ক'খানা দিতে হবে। মাঝে মাঝে নীচে গিয়ে রান্না শিখিয়েও দেয়।

দোতলার পশ্চিমের বারান্দায় ব'সে অমলা তখন তরকারী কুটে এক-খানা থালায় পরিপাটি ক'রে সাজিয়ে রাখছিল। এমন সময় তাদের দরজায় একখানা ঘোড়ার গাড়ী এসে থামলো ব'লে মনে হ'ল।

অমলা তখন রামহরির কথা ভাবছিল। গাড়ী থামার শব্দে সে ব্যস্ত-ভাবে রাস্তার দিকের বারান্দায় এসে ঝুঁকে দাঁড়ালো।

দেখলে, রামহরি, তার পিছনে একটি অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত স্ত্রীলোক। উপর থেকে তার মুখ সে দেখতে পেলে না। কিন্তু এই ভেবেই আশ্বস্ত হ'ল যে, রামহরি ফিরেছে এবং অসুস্থ দেহে ঘোড়ার গাড়ীতে নয়।

শুনতে পেলে, রামহরি স্ত্রীলোকটিকে বললে, ভেতরে গিয়ে ডান দিকেই সিঁড়ি।

রামহরি নিজে গোটা দুই বাক্স নামিয়ে গাড়ী ভাড়া মিটিয়ে দিতে লাগল।

অমলা তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এল। অর্দ্ধেক দূর যখন নেমেছে তখনই মেয়েটিকে দেখতে পেলে। তার মাথার ঘোমটা অনেকখানি স'রে এসেছে। চকিত দৃষ্টিতে চারিদিক দেখে নিচ্ছিল।

মধ্যপথেই অমলা থমকে গেল। নিজের মাকে ভালো মনে পড়ে না। যতখানি মনে পড়ে এবং ছবি দেখে আর কল্পনার সাহায্যে মায়ের মুখের যে ছবি সে নিজের মনে এঁকে নিয়েছে, এই মেয়েটির মুখ অবিকল সেই রকমের। তেমনি ছোট ললাট, চটুল চোখ, তীক্ষ্ণ ঠোঁটের উপর তেমনি ধারা হাসির রেখা বাঁকা ভাবে আলগোছে ছুঁয়ে আছে। তেমনি শ্যামবর্ণ ছোটখাটো চেহারা।

অমলা অবাক হয়ে গেল। দু'জনের চেহারার এমন আশ্চর্য্য মিল হ'তে পারে তা সে ভাবতেই পারে না।

মেয়েটি তখন তার কাছ পর্য্যন্ত উঠে এসেছে।

তার একটি হাত ধরে হেসে বললে, তুমি অমলা?

অমলা ওকে নিয়ে উপরের ঘরে আসতে আসতে বললে, হ্যাঁ। তুমি কি আমাকে চেন?

—চিনি।

ব'লে মেয়েটি আশ্চর্য্য ভঙ্গীতে হাসলে। অমলার বুকের ভিতর পর্য্যন্ত সে হাসিতে দুলে উঠল।

এ যে অবিকল তার মায়ের হাসি!

মহাকালের স্রোত পেরিয়ে আবার কি তারই বিস্মৃত তরঙ্গরেখা ওর স্মৃতির ঘাটে এসে ঘা দিলে !

অমলা বললে, তুমি কে ?

—আমি ?

মেয়েটি একবার নিজের চারিদিকে একবার ঘরের চারিদিকে চেয়ে তেমনি ক'রে আবার হেসে উঠলো।

এমন সময় নীচে রামহরির গলা পাওয়া গেল : ঠাকুর, একটু চায়ের জল চড়াও তো।

মেয়েটি হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

বললে, দাঁড়াও, ওঁর চা'টা ক'রে দিয়ে আসি।

অমলার বিস্ময়ের আর সীমা রইল না।

বললে, বাবার চা ক'রে দিতে তুমি যাবে ?

মেয়েটি আবার হেসে ফেললে। বললে, সেই জন্যেই তো আমায় এনেছেন ভাই !

বলেই তাড়াতাড়ি জিভ কেটে ফেললে : এই যাঃ! তোমায় 'ভাই' বলে ফেললাম। হিঃ হিঃ !

মেয়েটি আর দাঁড়ালো না। তর্ তর্ ক'রে নীচে নেমে গেল।

অমলা অবাক হয়ে চেয়ে দেখলে, অবিকল তার মায়ের মতো হাঁটন ! চলায় তেমনি আনন্দের ছন্দ।

অমলা ভাবতে লাগলো, কে এই মেয়েটি ? মেয়েটি যে খুব গরীবের তা বোঝা যায়। করপ্রকোষ্ঠে দু'গাছি শাঁখা ছাড়া আর কিছুই নেই। শক্ত করতল, শক্ত আঙুল এবং মলিন নখ দেখলেই বোঝা যায়, মেয়েটি চিরকাল

সংসারের সমস্ত শক্ত কাজ ক'রে এসেছে। কিন্তু এখানে এল কেন? রামহরি কোথা থেকে ওকে নিয়ে এল?

কিন্তু বেশ সপ্রতিভ। কত বয়স হবে? অমলার চেয়ে ছোট নিশ্চয়ই। কি অল্প ছোট, কিম্বা সমবয়সীই হবে হয় তো।

কিন্তু কে ও?

মিনিট পোনেরো পরে মেয়েটি ফিরে এল। হাতে এক বাটি চা।

অমলা জিজ্ঞাসা করলে, কার চা? আমার?

—হ্যাঁ।

—আমি চা খাই না তো।

—একেবারেই না?

—না।

অন্য সময় হ'লে অমলা এইখানেই থেমে যেত। কিন্তু কি জানি কেন, তার কেবলই নিজের মা এবং নতুন মা'র কথা মনে পড়ছে।

বললে, আমার নতুন মা মেয়েদের চা খাওয়া পছন্দ করতেন না। তিনি নিজেও খেতেন না, আমাকেও খেতে দিতেন না।

মেয়েটি এক মুহূর্ত্ত ওর মুখের দিকে থমকে চেয়ে রইল। তার পর জিজ্ঞাসা করলে, তোমরা বুঝি তাঁকে খুব মানতে?

—খুব।

—তিনি কি খুব রাগী ছিলেন?

এবারে অমলা হেসে ফেললে। বললে, মোটেই না। তিনি কখনও কাউকে কড়া কথা বলতেন না। কিন্তু ভারী রাশভারী ছিলেন। সবাই সেইজন্যে তাঁকে ভয় করতো।

—উনিও?

অমলা চমকে উঠল। বললে, 'উনি' কাকে বলছ? বাবা?

মেয়েটীর ঠোঁটের কোণে বিদ্যুৎ খেলে গেল। বললে, হুঁ?

অমলা অস্ফুটস্বরে বললে, কি জানি। হয়ত করতেন।

তার পরে বললে, কিন্তু তুমি কে বলবে?

মেয়েটি প্রথমে চুপ ক'রে রইল। তারপরে বললে, উনি কি তোমাদের কিছুই বলেননি?

অমলার মনে এতক্ষণে ব্যাপারটা যেন স্পষ্ট হ'ল। প্রাথমিক হতচকিত ভাবটা কাটতেই সে হো হো করে হেসে ফেললে। বললে, বোধ করেন নি। বোধ হয় ভেবেছিলাম, তোমাকে দেখেই চিনতে পারব।

—তার মানে?

—তার মানে তোমাকে দেখাই এস।

অমলা ওকে টানতে টানতে বাবার শোবার ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে বড় অয়েলপেন্টিংটার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললে, তার মানে বুঝলে?

মেয়েটি অস্ফুটস্বরে বললে, অনেকটা আমার মতো, না?

—হুবহু। তোমায় দেখে আমি চমকে উঠেছিলাম।

—তোমার নতুন মা?

না। আমার নতুন মা সকলের বিষয়ে সকলের থেকে স্বতন্ত্র। তাঁর জোড়া হয় না। ইনি আমার নিজের মা।

এতক্ষণ পরে হঠাৎ আমার খেয়াল হ'ল, এই মেয়েটি এসে পর্য্যন্ত পা ধুতেও পায় নি।

বললে, ছিঃ, ছি! তোমার এখনও পা ধোয়া হয়নি। না হ'ল তোমাকে জলের ধারা দিয়ে বরণ ক'রে নেওয়া, না হ'ল শাঁখ বাজানো। কি আশ্চর্য্য! শাঁখটা বাজাই বরং।

মেয়েটি তাড়াতাড়ি ওর হাত চেপে ধরলে। বললে, ছিঃ! সে আমার ভারী লজ্জা করবে। কিন্তু তোমাকে আমার ভারী ভালো লাগছে। হাত পা ধুয়ে আসি দাঁড়াও। তারপরে গল্প করা যাবে।

ও ফিরে এসে দেখলে, অমলা ওর জন্যে একখানা রঙীণ শাড়ী বের ক'রে বসে আছে।

বললে, এইখানা পরো।

কমলা লেবু রঙের শাড়ী। খোলা জানালা দিয়ে সূর্য্যাস্তের আভা এসে পড়ায় আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল। অমলা ওকে স্নো মাখিয়ে দিলে। তার পরে বাক্স থেকে গহনা বের ক'রে একটি একটি ক'রে ওকে পরিয়ে দিলে।

মেয়েটি বাধা দিলে। বললে, না, না। ও কার গহনা?

—আমার। তোমায় দিলাম।

অমলার চোখের দিকে চেয়ে ও আর কিছু বলতে সাহস করলে না।

অমলা বলতে লাগল: মায়ের ছবির দিকে চাইতাম আর মনে মনে বলতাম, তুমি যেন আমার মেয়ে হয়ে ফিরে এস। তোমাকে দেখার সাধ আমার মেটেনি। আজ মনে হচ্ছে, আমার প্রার্থনা যেন তিনি রেখেছেন। কিন্তু মেয়ে হয়ে তো এলে না।

—মেয়ে হয়েই তো এলাম অমলা। তোমার কোলে আমি মেয়ে হয়েই এলাম। নন্দরাণী নাম দিয়েই মা আমার মারা যান। গরীবের ঘরের মেয়ে, জন্মে কখনও কোল পাইনি। এতদিনে কোল পেলাম।

সন্ধ্যো হয়ে গেছে। ছেলেরা খেলা সেরে বাড়ী ফিরলো।

অমলা বললে, সুরেশ, মণি, এঁকে প্রণাম কর ভাই। ইনি আমাদের ছোট মা।

ওরা বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইলো।

—প্রণাম কর।

একে একে সবাই প্রণাম করলে। নন্দরাণী ছোটটিকে কোলের কাছে টানতেই সে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে হাত ছাড়িয়ে ছুটে পালিয়ে গেল।

এমন সময় রামহরির গলা পাওয়া গেল: ওরে অমলা ইয়ে হয়েছে।

বলতে বলতে রামহরি একেবারে দরজার কাছে এসেই স'রে গেল। একেবারে তার গলা পাওয়া গেল, ওদিকে ছেলেদের পড়ার ঘরে: পড়তে বোসো, পড়তে বোসো! আর দু'দিন পরেই সেকেণ্ড টার্মিনাল। মনে আছে তো?

নন্দরাণী মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হেসে উঠল: কি রকম লজ্জা পেলেন দেখলে?

অমলাও হেসে ফেললে। বললে, কি বলছিলেন শুনে আসি।

নন্দরাণী আবার হাসলে। বললে, কিচ্ছু বলেননি। তুমি বোসো।

তখনি নীচে রামহরির গলা পাওয়া গেল: ঠাকুর, দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে যাও। আমার ফিরতে দেরী হতে পারে।

সে কথা শুনে ওরা আর একবার হাসলে।

প্রথম দৃষ্টিতেই দুজনে দুজনকে ভালোবেসে ফেললে।

কিন্তু নন্দরাণীর সঙ্গে অমলার মায়ের চেহারার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও সম্পর্কটা কিছুতেই শেষ পর্য্যন্ত মা-মেয়ের মতো দাঁড়ালো না।

নন্দরাণী কিছুতেই ওকে মা ব'লে ডাকতে দেবে না। তার নাকি লজ্জা করে। হিসাব করে দেখা গেছে, নন্দরাণী ওর চেয়ে ছোট এবং বৈধব্যের জন্যেই হোক, আর যে কারণেই হোক, ওকে নন্দরাণীর চেয়ে আরও অনেক বেশী বড় দেখায়। সুতরাং নন্দরাণীকে ও ডাকে বৌমা ব'লে। কিন্তু আসল এবং অন্তরের সম্পর্ক দাঁড়ালো সখিত্বে।

নন্দরাণী ওকে সব কথা বলে। প্রথম-প্রথম অমলা সে-সব কথা শুনতে চাইতো না লজ্জা করত। পরে অভ্যাস হয়ে গেল। দু'জনে সে-সব কথা নিয়ে নিজেদের মধ্যে রসিকতা করতেও আর বাধে না। তাতে আর লজ্জাও করে না।

বিকেলে অমলা নিজের হাতে ওর চুল বেঁধে ওকে সাজিয়ে দেয়। ও কোন শাড়ীটা পরবে এবং তার সঙ্গে কোন ব্লাউজটা, তা ঠিক করবার মালিক অমলা। সে বিষয়েও সে খামখেয়ালী। কখনও নন্দরাণীকে সাজিয়ে দেয়, এলো খোঁপা বেঁধে, ভ্রূ এঁকে, মুখ পেণ্ট ক'রে, হালকা কয়েকখানা গহনা দিয়ে মডার্ণ মেয়ের মতো। কখনও বা মাথার চুল টেনে বেঁধে, গায়ে এক গা গহনা চাপিয়ে গলায় বেলফুলের মালা দিয়ে সেকালের মেয়ের মতো সাজিয়ে। নন্দরাণীর ক্ষমতা নেই তার উপর একটা কথা বলে। এমন কি পায়ের তোড়া ঝমর ঝমর করলেও তার সাধ্য নেই খোলে। শুতে যাওয়ার আগে অমলাকে একবার দেখা দিয়ে সব যে ঠিক ঠিক আছে তা বুঝিয়ে যেতে হবে।

খাটে শুয়ে রামহরি ওর তোড়ার শব্দে চমকে ওঠে।

—ও আবার কি!

নন্দরাণী লজ্জিতহাস্যে মুখ নীচু ক'রে বলে, কি করব? ছোট মা'র কাণ্ড! না বলবার উপায় নেই।

নন্দরাণীর উপর অমলার এই স্নেহ রামহরির ভালো লাগে। কিন্তু লজ্জাও করে। অমলা যেন অনেক বড় হয়ে গেছে। ওকে আর নিজের মায়ের মতো ভাবতে পারে না। অমলার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেও ওর লজ্জা করে। অমলাকে কিছু বলার থাকলে প্রায় নন্দরাণীর মারফৎই জানায়। কখনও যদি নিজে জানাতে হয়, সামনে গিয়ে মাথা নীচু ক'রে কথাটা জানিয়েই স'রে পড়ে। বাপের গাম্ভীর্য্য সে আর রাখতে পারে না। তার বয়স যেন নন্দরাণীর বয়সে নেমে এসেছে।

অমলার অবস্থাও একই প্রকার, বাপের সামনে সে সহজে পড়তে চায় না। কখনও দু'জনে সামনাসামনি প'ড়ে গেলে দু'জনেই ত্রস্তভাবে স'রে যায়।

অসুবিধা হয়নি কেবল নন্দরাণীর। রামহরি তার স্বামী, অমলা তার বন্ধু।

অমলা মাঝে মাঝে ভাবে, এ যেন ঠিক হচ্ছে না। নন্দরাণী তার মা, তার বাপের বিবাহিতা স্ত্রী, দেখতে অবিকল তার নিজের মায়ের মতো। তার সঙ্গে বয়সের বিচারে সখিত্বের সম্পর্কটা ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু নন্দরাণী তার নতুন মায়ের মতো গম্ভীর নয়। তার হাসি চাই, গল্প চাই, আনন্দ চাই। অমলার কাছে সে সম্পূর্ণ রকমে আত্মসমর্পণ করেছে। কিন্তু এইখানটায় অমলাকেও তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে।

আসল কথা দু'জনে দু'জনকে ভালো বসেছে। আর তাদের মধ্যেকার যোগসূত্র রামহরিকে মিলিয়ে গিয়ে সাধারণ মানুষে পরিণত হয়েছে। এইটে যখন ভেবে দেখে, তখন রামহরি কিম্বা অমলা কেউই খুসি বোধ করতে পারে না। অথচ এর জন্যে তারা কার উপর যে রাগ করতে পারে তাও খুঁজে পায় না।

এমনি ক'রে দিন যায়।

এই শহরে সিনেমা হাউস হয়েছে অনেক কাল। কিন্তু অমলারা কখনও সিনেমায় যায়নি। নতুন মার এ বিষয়ে কোনো আগ্রহ ছিল বলে কখনও বোঝা যায় নি। আর তার নিজের এ কখনও ছিল না যে মুখ ফুটে রামহরিকে বলে।

নন্দরাণী বললে, যাবে একদিন ?

অমলা সভয়ে বললে, ওরে বাবা !

—কেন ?

—বাবা সিনেমার উপর ভারি চটা।

নন্দরাণী মাথা নেড়ে বললে, ওঁর কথা আমি বুঝব। তুমি যাবে কি না বল না ?

—নিয়ে গেলে আর যাব না কেন ?

—বেশ। এই কথা রইল।

সামনের শনিবারে রামহরি দুপুর বেলাতেই আফিস থেকে ফিরল। এমন সময় বড় একটা সে ফেরে না।

নন্দরাণী হাসতে হাসতে এসে বললে, কোন শাড়ীটা পরব ছোট মা,

—হঠাৎ দুপুর বেলায় এ খেয়াল !

—বারে ! আজ সিনেমায় যাবার কথা ছিল না ?

—সত্যি ?

—হ্যাঁ। উনি তিনখানা টিকিট কিনে এনেছেন। বললেন, তিনটের শো'তে যেতে হবে। সন্ধ্যায় ফিরে এসে রান্না-বাড়া হবে।

ওরা সিনেমায় গেল। তিনজনে পাশাপাশি বসলো। মধ্যে নন্দরাণী, তার দুপাশে দু'জন। ছবি দেখতে দেখতে নন্দরাণী হাসে, কত কি

পরিহাসের কথা বলে। বিপদ হ'ল রামহরি আর অমলার। তারা কাঠের মতো শক্ত হয়ে বসে থাকে।

এর পরে যেদিন আবার ওরা সিনেমায় গেল, অমলা গেল না। ভীষণ মাথা ধরেছে বলে শুয়ে রইল।

অমলার কি যেন হয়েছে।

ঠাকুর তো কবেই ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রাঁধে অমলা। বলে, এখন তার শরীরে বেশ বল পেয়েছে। নন্দরাণী নিজে রাঁধবার জন্যে কত সাধাসাধি করছে। কিন্তু অমলা তাকে কিছুতে রাঁধতে দেয় না। নন্দরাণীর নিতান্ত যখন অসহ্য হয়ে ওঠে তখন বলে, তাহ'লে আমি কি করব বল একা-একা উপরে বসে থাকতে ভাল লাগে ?

মন ভাল থাকলে অমলা হেসে বলে, তাহ'লে বরং ওই টুলের উপর ব'সে ব'সে বইখানা পড়, আমি রাঁধি আর শুনি।

রামহরি কাজ কর্ম্মের ফাঁকে আজকাল মাঝে-মাঝেই বাড়ী আসে। অমলা তখন নন্দরাণীকে ঠেলে উপরে পাঠিয়ে দেয়। বলে, কি বলছেন, শুনে এস।

নন্দরাণী লজ্জা পায়, হাসে, কিন্তু উপরে যায়।

ফিরে এসে নন্দরাণী নিজের থেকেই বলে, কি একটা দরকারী কাগজ ফেলে গিয়েছিলেন।

অমলা হাসে। বলে, বাবা আজকাল ক্রমাগতই দরকারী কাগজ ফেলে যাচ্ছেন। পেয়েছেন তো ?

নন্দরাণীও হাসে। বলে, জানি না।

অমলা উঠে এসে ওর গাল টিয়ে দিপে বলে, জানি না বললে হবে কেন? না পাওয়া গেলে আবার কষ্ট করে ফিরে আসতে হবে তো?

—আসুক।

অসীম স্নেহভরে অমলা ওর মুখখানি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কি যেন দেখলে। আপন মনেই একটু হাসলে। তারপর আবার নিজের কাজে মন দিলে।

নন্দরাণী বললে, কি বলছিলেন জানো?

—কি?

—বলছিলেন, ক'লকাতা থেকে নাকি ভালো থিয়েটার এসেছে। এক টাকা ক'রে টিকিট। আমি ব'লে দিলাম, যাব না।

—সে আবার কি!

ঠোঁট ফুলিয়ে নন্দরাণী বললে, কি করতে যাব? তুমি তো যাবে না।

—যাব না কে বললে?

—আমি জানি। তুমি যাবে বলবে, কিন্তু ঠিক যাবার সময়ে বলবে মাথা ধরেছে। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, আর কোথাও যাব না।

অমলার মুখে ধীরে ধীরে যেন ছায়া নেমে এল। ধীরে ধীরে সে নন্দরাণীর ঘাড়ের উপর একখানা হাত রাখলে। মনে হ'ল, কি যেন বলবে। কিন্তু কিছুই বলতে না পেরে চুপ ক'রে রইল।

কিন্তু অমলার কি যে হয়েছে কেউ বুঝতে পারে না। নন্দরাণী কিছুতে ওকে রাঁধতে দেবে না এবং তাই নিয়ে কখনও যা করেনি তাই করেছে। অমলার সঙ্গে ঝগড়া করেছে। কিন্তু তবু পারেনি।

অমলা রাঁধবেই। নন্দরাণীর হাত থেকে কাজ কেড়ে নিয়ে সব কাজ

সে একাই করবে। তাকে কেউ বাধা দিতে পারে না। নন্দরাণী রেগে কথা বন্ধ করে। বিকেলে অমলা তাকে কত সাধ্যসাধনা ক'রে শান্ত করে।

রামহরি আজকাল যখন-তখন হুট ক'রে বাড়ী আসে। অমলা তার ঘরে বড় একটা যায় না। নন্দরাণীকে নিজের ঘরে টেনে নিয়ে আসে।

নন্দরাণী বলে, ধন্য মেয়ে তুমি মা! তোমাকে কেউ পারবে না।

ভোর বেলার চাঁদের মতো অমলা হাসে। বলে, সত্যি। আমি নিজে নিজেই বুঝতে পারি, আমি যেন নতুন মায়ের মতো শক্ত হচ্ছি।

—এত শক্ত হওয়া কি ভালো?

—নয়ই তো। খুব শক্ত মেয়েরা বেশী দিন বাঁচে না। আমার নতুন মা সেইজন্যেই—

নন্দরাণী ঝাঁপিয়ে উঠে ওর গাল টিপে ধরল: মুখপুড়ী, যা বলতে নেই সেই কথা!

অমলা নিজেকে মুক্ত ক'রে নিলে না! শুধু ওর রক্তহীন, শ্রান্ত চোখের কোণ বেয়ে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

কয়েক মাসের মধ্যেই অমলা শক্ত অসুখে পড়লো।

ডাক্তার বললেন, সেই হার্টটা। তার উপর এত টেম্পারেচার! কি হয় বলা যায় না। সামনের দু'তিনটে দিন যদি কাটে, তাহ'লে এ যাত্রা বেঁচে যাবে।

নন্দরাণী রামহরিকে বললে, এই বিছানা ছেড়ে এই দু'তিনটে দিন

আমি এক পা নীচে নামছি না। তুমি ঠাকুরের ব্যবস্থা কর নিজেও ক'দিনের ছুটি নাও।

সে কথা রামহরি আগেই ভেবেছে। বললে, আজকেই দরখাস্ত করব।

ছুটি পেতে রামহরির কোনোই অসুবিধা হ'ল না।

প্রথম রাত্রে টেম্পারেচারটা আরও বাড়লো। সেই সঙ্গে রোগিণীর ছটফটানিও।

নন্দরাণী বললে, সিভিল সার্জ্জনকে ডাকো।

রামহরি একটু বিব্রতভাবে ওর দিকে চাইলে।

নন্দরাণী বললে, কতটাকা ফি ?

—বোধ হয় ষোলো, কিম্বা রাত্রি ব'লে বত্রিশও নিতে পারে।

—তা হোক, ডাকো তাঁকে।

রামহরি দ্বিধা করতে লাগল।

নন্দরাণী বললে, টাকা আছে। তুমি ডাকো।

রামহরি তবু দ্বিধা করছে দেখে নন্দরাণী বললে, সত্যি টাকা আছে। সুরেশকে দিয়ে আমি সেই তোমার দেওয়া নতুন হারগাছা বিক্রি করেছি, সকালে ডাক্তার এসে যখনই বললে।

নন্দরাণী আঁচলে চোখ মুছলে।

সিভিল সার্জ্জন এলেন। প্রেসক্রপশান ক'রে ফি নিয়ে ব'লে গেলেন, কেমন থাকে সকালে খবর দিতে।

ভোরের দিকে টেম্পারেচার একটু নামলো। ছটফটানিও কম মনে হ'ল।

অমলা একবার চোখ মেলে চাইলে। অস্ফুটস্বরে বললে, বৌমা!

নন্দরাণী ওর মুখের উপর ঝুঁকে প'ড়ে বললে, এই যে আমি! একটু ভালো বোধ হচ্ছে ?

সে-কথার অমলা উত্তর দিলে না। বললে, আমার গহনাগুলো তোমাকে দিলাম।

একটু পরে বললে, তোমায় বলেছি না, শক্ত মেয়েরা বেশীদিন বাঁচে না! দেখলে তো?

—আবার সেই কথা বলছ?

অমলা আবার বললে, গহনাগুলো পোরো। দুঃখ কোরো না। বাঙ্গালীর ঘরের বিধবা মেয়ে, তার জন্যে দুঃখ করতে নেই।

সে চোখ বন্ধ করলে।

একটু পরে আবার বললে, সুরেশ কোথায়? ছেলেরা?

ওরা দিদির কাছে এসে দাঁড়ালো।

—বাবা কই?

রামহরির গলার স্বর বন্ধ হয়ে এল। একটা কথাও সে বলতে পারলে না।

অমলা ওর দিকে চাইলে। হঠাৎ তার চোখ যেন কৌতুকে ঝলমল ক'রে উঠলো। ঠোঁটের কোণে একটুখানি বাঁকা হাসি খেলে গেল।

তারপরে চোখ বন্ধ করলে।

সেইদিন দুপুরে অমলার বৈধব্য-জীবনের অবসান হ'ল।

ডাক্তারের ফি

মুন্সেফ কৃপানাথের সংসার বড় নয়। বড় হবার এখনও সময় হয়নি। মোটে তিন বৎসর তাদের বিবাহ হয়েছে। একটা ঠাকুর আছে, পিতার আমলের ভৃত্য বৃদ্ধ রামধন আছে, সংসারের ভারি ভারি কাজ করবার জন্যে আরও একটা চাকর আছে বুধিয়া।

কৃপানাথ দশটা-পাঁচটা কাছারী করে, দিস্তা দিস্তা রায় লেখে এবং দিনের পর দিন স্থূলত্ব লাভ করে। রিণা শুয়ে শুয়ে বই পড়ে আর ঘুমোয়। কখনও বা ষ্টোভে দু' একটা নতুন রান্না রাঁধে। নয়তো বাজারের হিসাবে ভুল ধ'রে চাকরটাকে বকুনি দেয়।

আর বৃদ্ধ রামধন একখানি ছোট ধুতি কোঁচা ক'রে প'রে কাজ কর্ম্ম তদারক করে। কখনও ঠাকুরকে রান্না সম্বন্ধে অপ্রয়োজনীয় উপদেশ দেয়, কখনও চাকরটার সঙ্গে বকাবকি করে। বস্তুতঃ এ বাড়ীতে বাবু এবং গৃহিণীর পরেই যে মর্য্যাদা হিসাবে তার স্থান, সে কথা দেখলেই বোঝা যায়।

মানুষটি রোগা, ছোট-খাটো সরুগলার উপর বর্ত্তুলাকার কেশবিরল মাথাটি সমস্ত সময় নড়বড় করছে। সে যখন আপন গর্ব্বে ঘুট ঘুট ক'রে বেড়ায় সে একটা দেখবার জিনিষ। কৃপানাথ আফিস নিয়ে ব্যস্ত, রিণা বই নিয়ে। সুতরাং সংসারের সকল কাজের কর্ত্তৃত্বভার তারই উপর এসে পড়েছে। এইটেকে সে সযত্নে এবং সগর্ব্বে চেখে চেখে দেখে।

কিন্তু ক'দিন থেকে তারও দিন ভাল যাচ্ছে না।

ঠাকুরটা চালাক লোক। কৃপানাথ হাকিম মানুষ, তাঁর কাছে তার যেতেই ভয় করে। বৌমাও এমন আলস্যের কুয়াশার অন্তরালে বাস করে যে, তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা অসম্ভব ব্যাপার। সুতরাং আখেরের ব্যাপারে সুবিধা করতে গেলে রামধনকে তোয়াজ করা প্রয়োজন।

তাই সে করে। কিন্তু রামধন ক'দিন থেকে মুখ নামিয়ে যেন আড়ালে আড়ালে ফিরছে। কিছুতেই ছোঁয়া দিচ্ছে না।

এ বাড়ীর হাওয়ার রামধন হ'ল 'ওয়েদার-কক'। তাকে দেখলেই বোঝা যায়, হাওয়া কোন দিকে বইছে। রামধনের চলা ফেরা দেখেই তারা বুঝেছে, বাবুতে গিন্নিতে কিছু একটা কলহ হয়েছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে গৃহস্থবাড়ীর ভৃত্যসুলভ কৌতূহল নিবৃত্তির কোন উপায় নেই। রামধন সমস্ত দুপুর বেলা এ বাড়ীর মৃত ও জীবিত কর্ত্তাদের কীর্ত্তি-কলাপ সালঙ্কারে বিবৃত করতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমানের যে ঘটনা জানবার জন্যে ঠাকুর এবং বুধিয়া অস্থির হ'য়ে উঠেছে সে সম্বন্ধে একটা কথাও বলবে না।

বুধিয়ার বয়স বেশী নয়। সে কিন্তু মাঝে মাঝে সন্দেহ করে।

বলে, তুমি পাগল হ'লে ঠাকুর। দিন-রাত্তিরই এইখানেই রয়েছি ঝগড়া হ'লে শুনতে পেতাম না?

ঠাকুর তার বিস্তৃততর অভিজ্ঞতা নিয়ে হাসে। বলে, ওরে বোকা, একি আমার বাড়ীর ঝগড়া যে, চীৎকার শুনে পাড়াশুদ্ধ লোক ছুটে আসবে। এ হাকিমের বাড়ীর ঝগড়া। কি রকম জানিস? গিন্নি বললেন, উঃ! বাবু বললেন, আঃ! ব্যাস্ ঝগড়া হ'য়ে গেল। তিন দিন আর মুখ দেখা দেখি নেই।

ঠাকুরের অঙ্গ-ভঙ্গীতে বুধিয়া হেসে খুন!

ওদের অনুমান মিথ্যা নয়। কৃপানাথের বিয়ে হয়েছে মোটে তিন বৎসর। ছেলেপুলেরও হাঙ্গামা নেই। দুঃখ-দৈন্য, অশান্তি দুর্ভাবনাও নেই। এরই মধ্যে প্রেমের ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে চিড় খাওয়া দুঃখের বিষয় সন্দেহ নেই।

অথচ এর কারণও বোঝা যায় না।

ওরা যে ইচ্ছা ক'রে ঝগড়া করে তা নয়। অথচ যে কারণে ঝগড়া বাধে, তা মোটেই ঝগড়া করার মতো বড় কারণ কিছুতেই নয়।

সেটাকে উপলক্ষ ছাড়া আর কিছুই ভাবা চলে না।

বসবার ঘরে বসে কৃপানাথ হয়তো একটা কিছু লিখছে। একখানা খোলা বই হাতে নিয়ে রিণা দোরগোড়ায় দাঁড়ালো।

হাসতে হাসতে বললে, আসতে পারি?

কৃপানাথের লেখাটা জরুরী বটে, কিন্তু এমন জরুরী নয় যে, এক মিনিট লেখাটা বন্ধ ক'রে ওর সঙ্গে হেসে দুটো কথা বলা যায় না।

সে রিণার মুখের দিকে চেয়ে চাবুকের মত তীক্ষ্ণভাবে বললে, না।

মুখ কালো ক'রে রিণা ফিরে গেল।

এরপরে আফিস যাওয়ার সময় পর্য্যন্ত দুজনে একটা কথাও হ'ল না। কলহের ঘটনাকাল এতই সংক্ষিপ্ত যে, চাকরবাকর কেউ টেরই পেলে না যে, কলহ হয়েছে। কেবল বুঝলে রামধন, বৌমাকে বাবুর খাবার সময় কাছে ব'সে থাকতে না দেখে।

অথচ সামান্য কারণে ঝগড়া।

রিণা দুপুরে বই নিয়ে বিছানায় শুয়ে থাকে। তার ঘুম আসে না। ঘুমও আসে না, পড়াও হয় না। কিছুই নয়, একটুখানি স্বামীর ঘরে

গিয়ে বসা। তাতেও আপত্তি! ক্রোধে অপমানে তার চোখ ফেটে জল বেরোয়।

কিন্তু একটু পরেই নিজের উপরই তার রাগ হয়।

এই সময় কৃপানাথকে যে কাছারীর কতকগুলো জরুরী কাজ সারতে হয় তা আর অজানা নেই। তবু তার কি দরকার ছিল সেখানে যাবার? আর এমন গুরুতর কথাই বা কৃপানাথ কি বলেছে? শুধু বলেছে, না! তার জন্যে অমন রাগ করা উচিত হয়নি। কৃপানাথের খাওয়া হ'য়েছে কি না কে জানে? খাবার সময় তার কি একবার গিয়ে কাছে বসা উচিত ছিল না?

নিজের ব্যবহারে রিণা লজ্জিত এবং অনুতপ্ত হয়।

কৃপানাথেরও সময় আনন্দে কাটে না।

উকিল তার মক্কেলের মামলা বুঝিয়ে দেবার জন্যে ব'কে মরছে। কৃপানাথের মন চ'লে গেছে অন্যত্র। আহা! ছোট মেয়ে রিণা। একলা বেচারার দিন-রাত্রির অধিকাংশ সময় কাটে। একটু কাছে এসে বসতোই না হয়। তাতে এমন কিছু ক্ষতি নিশ্চয়ই হ'ত না। অমন ক'রে আঘাত দেওয়া তাকে কখনই উচিত হয়নি।

কৃপানাথ মনে মনে ভাবতে থাকে কাছারীর শেষে কি ক'রে সে রিণার মান ভাঙ্গাবে। উকিল তখনও নিজের ঝোঁকে ব'কেই চলে।

এই ক'দিনেই রিণার অমন ফুলের মতন নরম শরীর তার দুর্ব্ব্যবহারের আঁচ লেগে যেন ঝলসে গেছে। যারা অনেক দিন দেখেনি তাদের চিনতে কষ্ট হবে, এমন চেহারা হয়েছে। বোধ হয় ভিতরে কোন রোগ হয়েছে। হওয়া কিছু মাত্র বিচিত্র নয়। মন গুমরে থাকলে রোগতো হ'তেই পারে। হয়তো এখনও তেমন কঠিন হয়নি। কিন্তু হ'তে কতক্ষণ!

কৃপানাথ স্থির করলে, কালকেই একজন ভাল ডাক্তার এনে দেখাতে হবে। এ জায়গাটাও আবার এমনি হতভাগা যে, ভাল ডাক্তারও নেই! মাসখানেকের ছুটি নিয়ে ক'লকাতা নিয়ে গেলে কেমন হয়?

বেচারা রিণা! তার জন্যে অবিলম্বে যা হোক্ একটা কিছু করা নিতান্তই দরকার হ'য়ে পড়েছে।

উকিল তখন তার বক্তৃতা শেষ ক'রে আসন পরিগ্রহ করলে।

কিন্তু কাছারীর শেষে কৃপানাথ যখন এই সব সুসঙ্কল্প নিয়ে ফিরে এল, ঘটনা তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে বইল।

সে ঘরে আসতেই রিণা দমকা হাওয়ার মতো যেন ছিটকে বেরিয়ে গেল। কৃপানাথ তাকে ধরে ফেলতে পারতো। হয়তো এক পশলা বৃষ্টি হ'ত। কিন্তু তার পরে মেঘ কেটে যেত। কিন্তু কৃপানাথের হাত-পা যেন কাঠের মতো আড়ষ্ট হয়ে গেল। সে একটা কথাও বলতে পারলে না। নিঃশব্দে চেয়ে রইল।

কাছারীর পোষাক খুলে সে হাত-মুখ ধুয়ে এল। রিণা তবু ফিরল না। রামধন অত্যন্ত সন্তর্পণে টেবিলের উপর খাবার নামিয়ে রাখলে। জল আনলে, পান আনলে। কৃপানাথ প্রথমটা সে দিকে ফিরেও তাকালে না। কিন্তু তখনই ভাবলে রিণা হয়তো ভাববে, তার বিরহ বেদনাতেই আহারে এই অরুচি হয়েছে। সে গোগ্রাসে খাবারগুলো সমস্ত খেয়ে ফেললে।

তারপর একটা পান মুখে দিয়ে ক্লাবে বেরিয়ে গেল।

রামধন কৃপানাথের বাপের আমলের চাকর। কৃপানাথকে সে কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করেছে। কৃপানাথের উপর তার স্নেহের ঠিক রূপ দেওয়া কঠিন। এখন সে আর ছেলেমানুষ নেই। বড় হয়েছে, হাকিম

হয়েছে। একদিন যাকে কত তিরস্কার করেছে, সে এখন মনিব। তাকে সে ভয় করে, সমীহ করে। অথচ মনে মনে কৃপানাথের সম্বন্ধে তার যে মনোভাব সে স্নেহ, এবং স্নেহ ছাড়া আর কিছুই নয়। শ্রদ্ধার চিহ্নমাত্র তাতে নেই।

রামধনের দেশ একটা ছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু সে যে কোথায় ছিল তা আর তার নিজেরই মনে পড়ে না। ছেলে বয়সে এখানে আশ্রয় পেয়েছিল। বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত এইখানেই কাটল। তার স্ত্রী নেই, পুত্র নেই, ঘর সংসার কিছুই নেই। এদের সংসারকেই সে নিজের সংসার ব'লে গ্রহণ করেছে।

কৃপানাথ এতটুকু মুখভার করলে সে চোখে অন্ধকার দেখে। তার মেজাজ খারাপ হ'য়ে যায়। অথচ অসহায় বেচারা, কি যে করবে তাও ভেবে পায় না।

কৃপানাথ চ'লে যেতে সে একবার রিণার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

রিণা বই পড়ছিল। মুখ তুলে বললে, কি ?

—কি রান্না হবে তাই জিজ্ঞাসা করতে এলাম।

—যা খুসী।

রামধন কিছুকাল থেকেই লক্ষ্য ক'রে আসছে, পোষাক এবং প্রসাধন পরিপাট্যে রিণার যেন আর আগ্রহ নেই। একটু আগে রামধন তাকে গা ধুয়ে আসতে দেখেছে। কিন্তু এখন দেখলে তা বোঝাই যায় না। না বেঁধেছে চুল, না করেছে প্রসাধন, না পরেছে কপালে টিপ, না পরেছে একখানা ভাল শাড়ী !

তার এই শ্রীহীনতা রামধনের ভাল লাগে না। যে বয়সের যা, তা নইলে ভালো লাগে ?

তবু বলবার কিছু নেই।

বললে, চিংড়ির কাটলেট কি···

রিণা গম্ভীর ভাবে বললে, বিরক্ত করোনা রামধন। বললাম তো তোমাদের যা খুসী রাঁধগে। আমার সময় নেই।

অন্য সময় রিণা যখন গম্ভীর ভাবে তাকে শাসন করে, সে আড়ালে গিয়ে হাসে। ওইটুকু মেয়ের গৃহিণীপণা তার ভারি সুন্দর লাগে। কিন্তু আজকে তার হাসবার মতো মনের অবস্থা নয়।

ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলে, চিংড়ি মাছের তাহলে কাটলেটই হবেতো?

রামধন মুখ ঝামটা দিয়ে বললে, তা নইলে চিংড়ি মাছ আনা হয়েছে কি জন্যে?

—না। আমি বলছিলাম, বৌমা নিজে ভাজবেন, না আমি ভাজব?

রামধন একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল।

—তোমার আস্পর্দ্ধা বাড়ছে ঠাকুর। বৌমা নিজেই যদি ভাজবেন তো তোমাকে মাইনে দিয়ে রাখা হয়েছে কেন?

আর যায় কোথায়! তারপরে ঠাকুরের সঙ্গে রামধনের বেধে গেল তুমুল কলহ। চীৎকার শুনে রিণা একেবারে দোতালার বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়াল। অন্য সময় হ'লে সে দুজনকেই ধমকে দিত। কিন্তু আজকে কিছুই বললে না। ক্লান্তভাবে নিজের জায়গায় ফিরে এসে বসল।

কি দরকার তার ধমক দেবার? সে এ বাড়ীর কে? যা মনে হয় তাই করুক ওরা।

একটু পরে কলহের বাচনিক অংশের নিবৃত্তি হ'ল। কিন্তু রামধন থমকে থমকে বেড়াতে লাগল। ঠাকুরের জোরে জোরে খুন্তী নাড়ার

শব্দে উপরের ঘরে রিণা পর্য্যন্ত অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠল। আর রাত্রে খেতে ব'সে কৃপানাথ উঠল চমকে।

তার পাতের একধারে ঘুঁটের মতো কালো কালো কি কতকগুলো সাজানো রয়েছে।

বিস্মিতভাবে কৃপানাথ জিজ্ঞাসা করলে, এগুলো কি ?

ঠাকুরের সন্ধ্যাবেলার দর্প এবং তেজ ইতিমধ্যে অনেকখানি শান্ত হ'য়ে গেছে।

ভয়ে ভয়ে বললে, কাটলেট।

—কাটলেট ! এইগুলো ! কে করতে বলেছিল ?

বিশেষ ক'রে যে কেউ করতে বলেছিল তা নয়। ঠাকুর ভয়ে ভয়ে চুপ ক'রে রইল।

—তুমি রাঁধতে শিখেছ কতদিন ?

ঠাকুর চুপ ক'রে রইল।

কৃপানাথ রামধনকে বললে, ওর মাইনে মিটিয়ে দিয়ে কাল ওকে দূর ক'রে দিবি।

ঠাকুর যে খুব ভয় পেয়ে গেল তা নয়। প্রায় ছ'মাস হ'ল কৃপানাথ এখানে বদলী হয়েছে, তার অব্যবহিত পরেই ঠাকুরও এসেছে। এর মধ্যে বহুবার তার জবাবের হুকুম হয়েছে, কিন্তু জবাব হয়নি। মফঃস্বলের সহরে ঠাকুর পাওয়া সহজ নয়। ঠাকুরও হাকিমের বাড়ীর চাকরীর গৌরব বিসর্জ্জন দিতে রাজী নয়।

এমনি ক'রে সবই ঠিক থাকে, কেবল অশান্তিই বেড়ে চলে।

পরের দিন দুপুরে একখানা টেলিগ্রাম এল। রিণার দিদি লীনা জানাচ্ছে সন্ধ্যার গাড়ীতে সে এখানে আসছে।

লীনা অনেক দিন থেকেই আসবে ব'লে শাসাচ্ছে। কিন্তু আসা আর ঘটে উঠছিল না। যখন লীনার সুবিধা হয় তখন তার স্বামীর সুবিধা হয় না, আবার যখন তার স্বামীর সুবিধা হয় তখন তার হয় না। এমনি ক'রে কতবার যে আসবার সমস্ত ঠিকঠাক ক'রেও আসা হয়নি, তার আর ইয়ত্তা নেই। সে জন্যে লীনা ঠিকই ক'রেছিল, এমন ক'রে আর চিঠি লিখে সে অপ্রস্তুত হবে না। যখন যাবে তখন যাওয়ার আগে একেবারে টেলিগ্রাম ক'রে দেবে।

কিন্তু ঠিক এই সময়টিই কি লীনা আসবার জন্যে বেছে নিলে? যখন রিণার সঙ্গে কৃপানাথের প্রত্যহ খিটমিট বাধে সেই সময়টা?

রিণা টেলিগ্রামটা পেয়ে মনে মনে বিব্রত এবং অস্বস্তি বোধ করলে। ষ্টেশনে কারও যাওয়া দরকার। সে সম্বন্ধেই বা কি করা যায়।

অনেক ভেবে চিন্তে রিণা রামধনের হাত দিয়ে টেলিগ্রামখানা কোর্টে কৃপানাথের কাছে পাঠিয়ে দিলে।

একটা জরুরি মামলা নিয়ে কৃপানাথের কোর্ট ভাঙতে প্রায় ছ'টা বাজলো তারপরে আর বাসায় ফিরে পোষাক বদলে ষ্টেশনে যাবার সময় রইলো না। কৃপানাথ কোর্ট থেকেই সোজা ষ্টেশনে চ'লে গেল।

লীনার স্বামী আসতে পারেননি। সে তার একটি দেওরকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে।

কৃপানাথকে দেখেই বললে, রিণা কোথায়? সে আসেনি কেন? তার শরীর ভালোতো?

কৃপানাথ একটু অপ্রস্তুত হ'ল। রিণার আসা উচিত ছিল নিশ্চয়ই। বললে, হ্যাঁ, শরীর ভালোই আছে। কেন আসেনি কে জানে? আমি কোর্ট থেকে সোজা আসছি।

—ও!

কিন্তু কৃপানাথের বাড়ী পৌঁছেই লীনার সমস্ত ব্যাপার বুঝতে বাকী রইল না। রিণার জন্তে তার খুব দুঃখ হ'ল। কিন্তু মুখে কিছুই বললে না। কেবল দেখে যেতে লাগল।

কৃপানাথ এবং রিণা খুব সতর্ক হ'য়ে রইল যাতে লীনা কিছু বুঝতে না পারে। সাধারণত স্বামী-স্ত্রীর সে সামাজিক সম্বন্ধ প্রাণপণ চেষ্টায় লীনার সামনে সেটাকে তারা বজায় রেখে চলল। ওদের নিয়ে সমস্ত সকাল সে হাসি গল্প করে। বিকেলে বেড়াতে যায়। ছুটির দিনে আমোদ প্রমোদের আর শেষ থাকে না।

কিন্তু লীনার কেবলই মনে হয় এর মধ্যে কোথায় যেন ফাঁক আছে, ফাঁকিও আছে! ভালো ক'রে লক্ষ্য ক'রে দেখেছে, ওরা দুজনে কখনও একলা থাকে না। কি যে ব্যাপার লীনা বুঝতে পারে না।

এ সব বিষয়ে তার প্রধান মন্ত্রী স্বামী। সে ভদ্রলোক সঙ্গে নেই। লীনা আর থাকতে পারলে না। তাঁকে একখানা চিঠি লিখে সব কথা খুলে জানালে। লিখলে:

কেন এমন হ'ল বলতো? মোটে তিন বৎসর ওদের বিয়ে হয়েছে। এর মধ্যে এমন তো হবার কথা নয়। আসছে মেলেই এর কারণ জানাবে। নইলে তোমার ফি কাটা যাবে।

সে ভদ্রলোক ডাক্তার। লীনার চিঠি পেয়ে হাসলেন। ফি কাটা যাবার ভয়ে দেরী করতে সাহস করলেন না। পরের মেলেই চিঠি দিলেন, আর পাঠালেন একটি প্যাকেট।

চিঠিতে লিখেছেন:

গৃহস্থ ঘরের মেয়েরা বিবাহিত জীবনে রূপের প্রয়োজন বড় একটা

স্বীকার করে না। পরজন্ম—পূর্ব্বজন্ম, ইহকাল—পরকাল ক'রে সমস্ত ব্যাপারটাকে আমরা আধ্যাত্মিকতায় এমন ঘোলাটে ক'রে তুলেছি যে, দাম্পত্য জীবন থেকে মেয়ের রূপচর্চ্চাকে এক রকম ছেঁটেই ফেলেছে। প্যাকেটে যে সমস্ত জিনিষ পাঠালাম, সেগুলো খাবার ওষুধ নয়, মাখবার। ব্যবহার ক'রে ফল পেলে ফি'টা কে দেবে? তুমি না রিণা? না তোমরা দুজনেই?

লীনা হাসতে হাসতে প্যাকেটটা খুলে ফেললে।

ও হরি! ওষুধ কোথায়? এযে ক'শিশি তেল, সাবান আর স্নো!

লীনা চ'টে গেল। এই বুঝি ডাক্তারী বুদ্ধি!

দিন পনেরো পরের কথা বলছি।

স্বামীকে একটা কড়া চিঠি লেখবার জন্যে লীনা নিভৃতে কলম নিয়ে বসল। এত দিনের মধ্যে একটিবারও ভদ্রলোক যে আসবার সময় ক'রে উঠতে পারলেন না, রাগ সেই জন্যেই। তা ছাড়া রিণার ব্যাপারটারই বা কি হবে?

লীনা লিখতে লাগল।

হঠাৎ মনে হ'ল পাশের ঘরে কারা যেন ফিস-ফাস ক'রে কথা বলছে। এ বাড়ীতে ফিস-ফাসের বালাই নেই। কারা অমন ক'রে কথা বলে?

লীনা দুটি ঘরের মধ্যবর্ত্তী দরজায় কান পাতলে। হ্যাঁ, ফিস-ফাসই তো বটে! শাড়ীর খস-খস, চুড়ির ঠুন-ঠুন, আর···

আস্তে আস্তে লীনা দরজাটা একটু ফাঁক করলে। দেখে চক্ষুস্থির।

দু'হাত দিয়ে কৃপানাথ রিণার মুখখানি তুলে ধরেছে। কালো মেঘের মতো একটি রাশ চুল তার দু'হাত বেয়ে ঝুলছে।

বলছে, তুমি কি সুন্দর রিণা!

আর···

লীনা চেয়ে দেখলে, ওদিকের দরজার পর্দ্দার আড়াল থেকে আরও একজন এই দৃশ্য দেখছে। চোখ দুটি তার ছোট হ'য়ে গেছে, আর হাসিতে মুখখানি আকর্ণ বিস্তৃত হয়েছে। তার যেন আর জ্ঞান নেই। সে রামধন।

বিকেলে রিণাকে বুকে টেনে লীনা বললে, দুপুরে কি হচ্ছিল রে?

লজ্জায় রিণার মুখ রাঙা হ'য়ে উঠল। বললে, কখন?

চোখে একটা কটাক্ষ হেনে লীনা বললে, সেই তখন।

মুখ নামিয়ে রিণা বললে, যাও!

হাসতে হাসতে লীনা বললে, আমি না হয় গেলাম, কিন্তু ডাক্তারবাবু যে ফি চায়! সে তো ছাড়বে না!

মাথায় একটা ঝাঁক দিয়ে রিণা বললে, আমার এখন সময় নেই। আমার হ'য়ে তুমিই ফি'টা দিয়ে দিও।

নীড়ের মায়া

তিন দিনের জ্বরে যখন দ্বিতীয়া গৃহিণী কাঞ্চনমালাও বনমালীকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল, তখন বনমালীর বয়স একান্ন কি বাহান্ন। কচি কচি ছেলেমেয়েগুলিকে তিনি কোলে তুলে নিলেন বটে, কিন্তু তারপরে কি যে করবেন ভেবে পেলেন না।

বড় ছেলেটি বছর পোনেরোর। তার জন্মে ভাবনা নেই। নিজের খবরদারী নিজেই করবার বয়স তার রয়েছে। মেজটি মেয়ে, বয়সও বছর এগারো-বারো। তারও জন্মে না হয় ভাবনা নেই। কিন্তু পরের দুটি? তারা যে নিতান্তই বাচ্চা! ছোটটি তো সবে হাঁটতে শিখেছে।

ভগবান যার সর্ব্বনাশ করেন, বুঝি এমনি ক'রেই করেন। বড়টি যদি মেয়ে হ'ত, তা হ'লে এত বিপদ হত না। পোনেরো বছরের বাঙালী মেয়ে স্বচ্ছন্দে সংসারের ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে সকলকে নিশ্চিন্ত করতে পারত। কিন্তু ওই বয়সের একটা ছেলে নিতান্তই অকর্ম্মণ্য। সংসারের বোঝা বইবার তার শক্তিও নেই, অবসরও নেই।

সম্বল একটি বৃদ্ধা পিসিমা। তিনি দিনে মরছেন, রাতে বাঁচছেন, মৃত্যু যদি এঁকে নিয়ে তাঁর কাঞ্চনমালাকে রেহাই দিত, কি সুখেরই না হ'ত!

বনমালী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সেই পিসিমারই ঘরের দিকে চললেন। এঁ ক'দিন যদি বা তিনি উঠে-হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন, কাঞ্চনমালা যাওয়ার পর থেকে একেবারে শয্যা নিয়েছেন।

তাঁর বিছানার পাশে ব'সে বনমালী শাস্ত্রের অনেক নিগূঢ় তত্ত্বকথা শোনালেন। এই জীবন যে নলিনীদলগত জলের মতো তরল—এই পৃথিবী যে পান্থনিবাস, মানুষ এখানে দু'দিনের জন্যে আসে এবং কাজ ফুরিয়ে গেলেই চলে যায় ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক শাস্ত্রীয় বাক্যে পিসিমার অশ্রুস্রোত কিছু পরিমাণে নিরুদ্ধ হ'ল সত্য, কিন্তু তিনি উঠে বসতে পারলেন না। শাস্ত্রবাক্য মনকে প্রবোধ দিতেই পারে, দেহে শক্তিসঞ্চার করতে পারে না। বনমালী বুঝলেন, এ বিপদে পিসিমার কাছ থেকে কয়েক গ্যালন অশ্রু ছাড়া আর কিছুই প্রাপ্তির সম্ভাবনা নেই। এই বানচাল সংসারতরণী চালাতে তিনি নিতান্তই অশক্ত।

প্রথম পক্ষের দুটি মেয়ে আছে বটে, কিন্তু তারা ঘরণী-গৃহিণী। দুজনেরই সম্পন্ন গৃহস্থ-বাড়ীতে বিবাহ হয়েছে। ক্ষেত-খামার, জোত-জমা, জন-মজুর প্রচুর। তাদের পক্ষে বড় জোর দু'দশ দিনের জন্যে এখানে আসা সম্ভব। তার বেশী নয়।

পত্নী-শোকের চেয়ে এই সব দুশ্চিন্তাই বনমালীর মনে প্রবল হয়ে উঠল। রাঁধা-বাড়া করবে কে? ছেলেপুলেদের নাওয়াবে-খোয়াবে কে? বনমালী সম্পন্ন গৃহস্থ। তার সংসারটি ছোট নয়, কাজও কম নয়। কাঞ্চনমালা দিনরাত্রি খিটমিট করত ব'লে বনমালী কত বিরক্ত হতেন। এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে কতদিন কত ঝগড়াই হয়েছে। আজ বনমালী বুঝতে পারলেন, এতবড় বোঝা যাকে দিনের পর দিন বইতে হয়, শনিবার নেই, রবিবার নেই, ছুটি নেই, তার পক্ষে মেজাজ ঠিক রাখা সত্যিই বড় কঠিন।

বনমালীর দূর সম্পর্কের বিধবা একটি বোন আছে। সম্বন্ধটা দূর হলেও ক্রমাগত যাওয়া-আসা, মেলা-মেশায় সম্পর্কটা নিকটই। নির্ঝঞ্ঝাট

বিধবা স্ত্রীলোক, ছেলে-মেয়ে নেই। দেওর-ভাসুরের ঘরে উদয়াস্ত নিরবকাশ পরিশ্রমের বিনিময়ে দু'বেলা নির্য্যাতন এবং এক বেলা দুটো খেতে পায়। সেই যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে কাঞ্চনমালার জীবিতকালে একবার সে কিছুদিনের জন্যে এখানে এসেছিল। ইচ্ছা ছিল, বৈধব্য জীবনের অবশিষ্টকাল ভায়ের আশ্রয়েই কাটিয়ে দেবে। কিন্তু মুখরা কাঞ্চনমালার জন্যে তার এখানকার অবস্থিতিকালও দীর্ঘ হতে পারেনি।

সেই বিস্মৃতপ্রায় ইতিহাস স্মরণ ক'রে বনমালী দমে গেলেন। যেদিন সুরবালা চৌর্য্যাপরাধে বিতাড়িত হয়েছিল, সেদিন বনমালী নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দেখেছিলেন। তাকে রক্ষা করতে পারেননি, একটা সান্ত্বনার কথাও বলতে পারেননি। অথচ কলঙ্কটা যত বড়ই হোক, অপরাধটা তত বড় ক'রে দেখতে বনমালী অন্তত পারেননি।

দেবরের শিশুপুত্রের ঘুড়ির পয়সা জোগাবার জন্যে সুরবালা যদি সামান্য কিছু চাল চুরি ক'রে গোপনে বিক্রিই ক'রে থাকে, সেটা এমন একটা অপরাধ নয় যে তার জন্যে পাড়ার পাঁচজনকে ডেকে এনে পঞ্চায়েৎ বসাতে হবে। বনমালী ইচ্ছা করলে তাকে রক্ষা করতে পারতেন। কিন্তু তাঁর কেমন মনে হ'ল, স্বামীগৃহে নির্য্যাতিতা যে বিধবা ভ্রাতৃগৃহে এসেও দেবরপুত্রের মমতা বিস্মৃত হতে পারে না, দেবর-ভাশুরের লাঞ্ছনা সত্ত্বেও তার অবলম্বনহীন জীবনের মূল শিকড়টি যে আসলে ওই নিষ্করুণ স্বামীগৃহের মাটীতেই আবদ্ধ তাতে আর ভুল নেই। সেইখানেই তার ফিরে যাওয়া উচিত।

সেইদিন থেকে আজ পর্য্যন্ত যে-ভগিনীর একটা খোঁজ নেওয়ার আবশ্যক বিবেচনা করেননি, আজকে তারই কাছে গিয়ে কি ক'রে যে দাঁড়াবেন সেই ভেবে তিনি বিব্রত হয়ে উঠলেন।

কিন্তু বনমালীকে বিশেষ বিব্রত হতে হ'ল না।

একদিন সকালে মড়াকান্নার শব্দে ঘুম ভেঙে উঠেই দেখে, তারই বাড়ীর উঠানে ব'সে সুরবালা অতি করুণ কণ্ঠে মৃত ভ্রাতৃজায়ার উদ্দেশে শোক নিবেদন করছে।

বনমালী যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। কোঁচার খুঁটে অশ্রুমার্জ্জনা ক'রে বললেন, সুরবালা এলি ?

কান্না থামিয়ে সুরবালা বললে, থাকতে পারলাম কই দাদা ? কিন্তু কাছেই তো থাকি, সে সময় একটা খবর দিয়ে আনাতেও তো পারতে।

অপ্রস্তুত হয়ে বনমালী বললেন, তখন সময় ছিল না দিদি। এখন সময় হতে তোকে আনবার কথাই ভাবছিলাম। বেশ হ'ল, তুই নিজেই এলি। এই তো দেখছিস ঘর-দোরের ছিরি। ওই দেখ ছেলেমেয়েগুলোর চেহারা। পিসিমা বোধ হয় এখনও ওঠেনইনি। এই সব দেখে-শুনে নিয়ে আমাকে এ যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি দে ভাই, শেষ বয়সে এ আর আমার সহ্য হবে না।

শেষের দিকে তাঁর গলার স্বর ভারি হয়ে এল।

কান্নার শব্দে ছেলেমেয়েরা ইতিমধ্যেই পিসিমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। সুরবালা দু'হাত দিয়ে তাদের বুকের মধ্যে টেনে নিলে।

বনমালী সেদিকে একবার চেয়ে তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন। পত্নীবিয়োগের এত দিন পরে কান্না তাঁর গলার কাছ পর্য্যন্ত ঠেলে উঠল। এতদিন পরে নিজেকে সম্বরণ করা তাঁর পক্ষে যেন অসম্ভব হয়ে উঠল।

তারপরে পিসিমা উঠলেন। পাড়া-প্রতিবেশী গৃহিণীরা এলেন। কর্ম্মহীন দু-চার জন উলঙ্গ শিশুরও সমাবেশ হ'ল।

সবাই বললেন, বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে। তুই আসবি না তো কে আসবে? ওই তো পিসিকে দেখছিস। ওর কি আর শক্তি আছে? যদ্দিন না নতুন বৌ আসছে, তদ্দিন সব দেখ্ শোন্, ছেলেমেয়েদের সময়ে দুটো খেতে দে, থাক্।

বনমালী ফিরে এসে দেখলেন, উঠান ঝরঝরে নিকানো। ঘরের মেঝে, বারান্দা ঝকঝক করছে। অনেক দিন পরে বাড়ীর আবার শ্রী ফিরেছে। পত্নীবিয়োগবেদনা ভুলে বনমালীর ঠোঁটে পরিতৃপ্তির আভাস জাগল।

বারো বছর বয়সে সুরবালার বিবাহ হয়েছিল। পোনেরো বছরে বিধবা হয়। ছেলেপুলে হয়নি। স্বামীকে চেনবার সবে সুযোগ পেয়েছিল। নীড় বাঁধবার সাধ প্রতিপদের শশিলেখার মতো মনের আকাশে উঠতে না উঠতেই মিলিয়ে গিয়েছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর তার কাজ হ'ল দাসীর। যা-কিছু শ্রমসাধ্য সেই সব কাজের ভার পড়ল তার উপর। তার কাজ শুধু খাটবার, শুধু হুকুম তামিল করবার। দেবার-থোবার সাজাবার-গোছাবার কাজ তার জায়েদের। তাদেরই ঘর, তাদেরই সংসার। সে শুধু এক বেলা দু'টি অন্নের বিনিময়ে খাটে।

বনমালীর সংসারে এবারে এসে সে প্রথম গৃহিণীত্বের স্বাদ পেলে। বৃদ্ধা পিসি বিছানা ছেড়ে বড় একটা ওঠেন না। বনমালী বাইরে-বাইরেই ঘোরেন। ঘুম থেকে উঠে ঘর-দোর নিকোনো থেকে আরম্ভ ক'রে শয্যা

গ্রহণ করার পূর্ব্বে বনমালীর কনিষ্ঠ সন্তানটিকে দুধ খাওয়ানোর হাঙ্গামা পোয়ানো পর্য্যন্ত সব কাজ একা তার। তাকে হুকুম করার কেউ নেই। যেটি সে নিজে না করবে সেইটিই হবে না। বাঁধবার জন্যে এমনি একটা ঘরেরই কল্পনা বোধ হয় তার অবচেতন মনের মধ্যে ছিল। তার আনন্দের আর সীমা রইল না।

প্রত্যেকটি ঘর সে আবার নতুন ক'রে নিজের মনের মত সাজিয়েছে। এদিকের খাট ওদিকে গেছে। ছবিগুলো ঝেড়ে-মুছে ফের নতুন ক'রে টাঙিয়েছে। বনমালীর শোবার ঘরে জোড়া-খাট ছিল। কাঞ্চনমালার মৃত্যুর পরে তার আর দরকার নেই। ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি অন্য ঘরে তার কাছে শুচ্ছে। একখানি খাট সে সরিয়ে নিয়ে গেল পিসিমার ঘরে। গদির বিছানায় শুয়ে পিসিমা বড় সুখী। এতদিন তাঁকে মেঝের উপর শুতে হ'ত! খুশি হয়ে তিনি সুরবালার মাথায় হাত দিয়ে অনেক আশীর্ব্বাদ করলেন।

বনমালীর জোড়াখাটের আর দরকার নেই সত্যি। তবু এত তাড়াতাড়ি একখানা খাট সরিয়ে নিয়ে যাওয়া তাঁর ভালো লাগল না। বহুকাল ধরে 'ওঘরে দু'খানি খাট পাতা ছিল। দুপুরে শুতে এসে তাঁর বড় ফাঁকা-ফাঁকা বোধ হ'ল।

জিজ্ঞাসা করলেন, সে-খাটখানা আবার কোথায় চালান করলি সুরো?

সুরবালা বললে, পিসিমার ঘরে। নীচেয় শুতে তাঁর বড় কষ্ট হচ্ছিল। বুড়ো মানুষ!

বনমালী আর কিছু বলতে সাহস করলেন না। সুরবালা এবারে আর ভিক্ষুকের মতো আসেনি। বনমালীর গৃহে আজকে তার প্রয়োজন

অবিসম্বাদী। বনমালী চুপ ক'রে রইলেন। কিন্তু দুপুরে আর তাঁর ঘুম হ'ল না। তাঁর কেমন মনে হ'ল, শুধু পিসিমার প্রয়োজনেই খাটখানি ওঘরে অপসৃত হয়নি। এর মধ্যে আরও যেন কিছু আছে। এর মধ্যে কাঞ্চনমালার বিগত ব্যবহারের প্রতিশোধের প্রচ্ছন্ন ঝাঁঝও যেন পাওয়া যায়। কাঞ্চনমালার স্মৃতি অনন্তকাল ধ'রে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, এমন পণ অবশ্য বনমালী করেনি। তাই ব'লে এত শীঘ্র তার হাতের সমস্ত স্পর্শ মুছে ফেলে দেবার প্রয়াসও তার শোভন মনে হ'ল না।

কিন্তু বনমালীর মনের কথা সুরবালা টের পেলে কি-না বোঝা গেল না। সে যথাপূর্ব্ব নিজের গৃহিণীপনায় মনোনিবেশ করলে। সে গৃহিণীপনা শান্ত এবং অনুচ্ছল না হতে পারে। ভরা বর্ষার উন্মত্ত নদীর মতো তাতে উপদ্রব থাকতে পারে। কিন্তু তাকে তিরস্কার করা চলে না। পরিচ্ছন্ন গৃহসজ্জায়, ছেলেমেয়েগুলির দেহশ্রীতে তার পরিচয় এতই স্পষ্ট। এমন কি এই ক'মাসে বনমালীর শুষ্ক দেহেও একটুখানি নেয়াপাতি ভুঁড়ির উন্মেষ হয়েছে। এ নিয়ে বন্ধুমহলে আজকাল তাঁকে কিছু কিছু বিদ্রূপও সহ্য করতে হয়।

বনমালী হাসে।

কাঞ্চনমালার হাতের রান্না সুরবালার মতো এমন সুন্দর ছিল না। তার খাওয়ানোও ছিল নিতান্ত ঘরোয়া ব্যাপার। তাতে আন্তরিকতা যদি বা ছিল, এমন যত্ন ছিল না। আর এ যেন সুরবালার গৃহে তার প্রাত্যহিক নিমন্ত্রণ।

কিন্তু এত ক'রেও সুরবালার মনের ভয় যায় না।

কে জানে তার এ গৃহিণীপনা কতদিনের। কবে হয়তো শুনবে,

বনমালীর বিবাহের দিন স্থির হয়েছে। একে বনমালীর বুড়ো বয়সের বিয়ে, তাতে এ কালের মেয়ে, নিতান্ত ছোট মেয়ে তো আর আসবে না। বিয়ের পর সংসারের ভার নিজের হাতে তুলে নিতে তার বেশী দিন হয়তো লাগবে না।

তখন?

আবার যে-কে-সেই। দু'বেলা মুখ-ঝামটা খেয়েও এই ছেলে-মেয়েগুলি তাকেই মা ব'লে ডাকবে। তারই পিছু পিছু ঘুরবে। সুরবালা উদয়াস্ত খাটবে-খুটবে, ফরমাসমত রাঁধবে-বাড়বে। কিন্তু সুমুখে বসিয়ে কাউকে খেতে দিতে পারবে না। সেই যেমন কাঞ্চনমালার রাজত্বে ছিল। যেমন তার দেবরের সংসারে ছিল। অথচ সুমুখে বসিয়ে নিজের হাতে পরিবেশন ক'রে মেয়েমানুষ যদি খাওয়াতেই না পারে, তবে আর তার ইহজীবনে রইল কি?

এত সুখেও সুরবালার সুখ নেই। তার কেবলই ভয় করে তার দুর্ভাগ্যে এত সুখ বুঝি সইবে না।

এই ভয় ক্রমে উপসর্গে পরিণত হ'ল।

বাইরের ঘরে বনমালীকে বন্ধুবান্ধব নিয়ে পরিহাস করতে শুনলেই সে সব কাজ ফেলে রেখে আড়ি পেতে শোনে, কি কথা হচ্ছে। কোনো অপরিচিত লোককে আসতে দেখলেই ভয়ে তার বুক কেঁপে ওঠে। কে যে কি মতলবে আনাগোনা করে কে বলতে পারে। বনমালীর মনের মধ্যেই যে ধীরে ধীরে আবার কি আকাঙ্ক্ষা দানা বেঁধে উঠেছে, তাই বা কে জানে?

অবশেষে কৌশলে একদিন সুরবালা নিজেই কথাটা পাড়লে।

সুরবালা সেদিন অনেক যত্নে একটা নতুন তরকারি রেঁধেছিল।

তার আস্বাদ গ্রহণ ক'রে বনমালী পুলকিত চিত্তে বললেন, তুই রাঁধিস বড় চমৎকার সুরো। সবাই বলছে, তোর হাতের রান্না খেয়ে আমার শরীর সেরে উঠেছে।

—আচ্ছা, হয়েছে!—বলে লজ্জায় আনন্দে সুরবালা তাড়াতাড়ি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

ওর লজ্জা দেখে বনমালী হেসে ফেললেন।

বললেন, সত্যি রে। লোকের কথা ছেড়ে দে, আমি নিজেই তো বুঝতে পারছি।

—ছাই পারছ!

ব'লে রান্নাঘর থেকে আর একটু তরকারি নিয়ে এসে সুরবালা ওর পাতে দিলে।

একটু পরে বেশ ভব্যযুক্ত হ'য়ে বললে, আমার মামা-শ্বশুরের একটি মেয়ে আছে, বেশ বড়-সড়। হাসছ যে, বিশ্বাস হচ্ছে না?

হাসি থামিয়ে বনমালী বললেন, বিশ্বাস হবে না কেন? অনেকের মামাশ্বশুরেরই তো বড় মেয়ে থাকে। তার পর কি হ'ল বল।

—বলছিলাম কি, তুমি অমত কোরো না। আমি বিয়ের জোগাড় করি। যদি দেখতে যেতে চাও তো—

—কিছু দরকার হবে না। কিন্তু তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে সুরো? আমি এই বয়সে আবার বিয়ে করতে যাব কোন্ দুঃখে?

—এ বয়সে কি কেউ বিয়ে করে না?

—করুক গে। কিন্তু আমার অদৃষ্টে যদি বউ নিয়ে সংসার করাই থাকত তা হ'লে পর পর দুটো বউ মরবে কেন?

—তাই ব'লে—

সুমুখের ভাতগুলি তাড়াতাড়ি কোলের দিকে টেনে নিয়ে বনমালী বললেন, না, না সুরো। ওসব পাগলামি করিস নে। যে ক'টা দিন বাঁচি, এমনি ভাল-ভাল রান্না রেঁধে খাওয়া, ছেলে-পুলেদের দেখ্-শোন্। ব্যস্।

বনমালীর কথা শুনে সুরবালা খুশি হ'ল, কিন্তু সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হতে পারলে না। পুরুষমানুষের মন বদলাতে কতক্ষণ! তাদের যত দরদ সংসারের উপর, তত দরদ ছেলে-মেয়ের উপর! তারা যে কি চায়, তা নিজেই জানে না। পুরুষমানুষকে সে বয়স্ক শিশু ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে না। শিশুর মত তাদের চিন্তারও সামঞ্জস্য নেই, বুদ্ধিরও স্থিরতা নেই।

দেখতে দেখতে চারিদিক থেকে বনমালীর উপর আক্রমণ আরম্ভ হ'ল। বন্ধু-বান্ধব তো আছেই, সেদিন মুখুয্যেগিন্নিও এই নিয়ে যথেষ্ট অনুরোধ ক'রে গেলেন।

বললেন, ব্যাটা ছেলে বিয়ে করবে না, এই কি কখনও হয় ঠাকুরপো? কি বল্ সুরো?

শান্তকণ্ঠে সুরো বললে, তোমরাই বল বৌদি। আমি ব'লে-ব'লে হয়রাণ হয়েছি।

বনমালী হেসে ফেললেন। বললেন, হয়রাণ হয়েছিস তো আবার ওঁকে ডেকে এনেছিস কেন?

এই প্রসঙ্গ ওঠামাত্র সুরবালার মুখ শাদা হয়ে গিয়েছিল। সেদিকে লক্ষ্য না ক'রেই মুখুয্যেগিন্নি বললেন, আমাকে কেউ ডেকে আনেনি ভাই,

আমি নিজেই এসেছি পাড়াশুদ্ধ লোককে জিগ্যেস ক'রে দেখ, আমি উচিত কথা বলছি কি-না।

বনমালী হাত জোড় ক'রে বললে, পাড়াশুদ্ধ লোককে জিগ্যেস করতে হবে না বৌদি, কিন্তু আপনিই বলুন আমার বয়সটা কত?

—কত শুনি?

—পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে।

জিহ্বা ও তালুর সাহায্যে একটা অস্ফুট শব্দ ক'রে মুখুয্যেগিন্নি সুরবালার দিকে চেয়ে বললেন, শুনলি কথা? পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে! পঞ্চাশ বছর আবার ব্যাটাছেলের একটা বয়স নাকি?

মুখুয্যেগিন্নির বোধ হয় কোনো স্বার্থ ছিল। কিন্তু তিনি সুবিধা করতে পারলেন না। পিসিমার চোখের জল ব্যর্থ হ'ল। এমন কি, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার দলও একে একে হতাশ হয়ে ফিরে গেল। শেষ পর্য্যন্ত বন্ধুর দলও হাল ছেড়ে দিলে।

এমনি ক'রে প্রতিপক্ষ দলের সর্ব্বদিকের আক্রমণ বনমালী প্রতিহত করলেন সত্য। তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরেও গেল। কিন্তু সেই সঙ্গে বনমালীর মনোদুর্গের কতখানি ক্ষতি ক'রে দিয়ে গেল তা তখন টের পাওয়া গেল না বটে, কিন্তু কিছু দিন পরেই টের পাওয়া গেল।

বনমালী তখন রোগশয্যায়।

সাধারণ জ্বর। কঠিন কিছু নয়। কিন্তু উত্তাপ ৯৯ ছাড়ালেই আর বনমালীর জ্ঞান থাকে না। গানে-বক্তৃতায় হাসিতে কান্নায় চীৎকারে সে বাড়ীশুদ্ধ লোককে অস্থির ক'রে তোলে।

সুরবালা একা মেয়ে, কি করবে? তবু ওরই মধ্যে দশবার এসে ওষুধটা খাইয়ে যায়, সাগুর বাটিটা এনে মুখে ধরে, দু'টো ফল কুটে দিয়ে

যায়। কখনও বা একটু ব'সে মাথায় বাতাসও করে। আসলে ছেলে-গুলো হয়েছে দুষ্টুর শিরোমণি। সুস্থ অবস্থায় বাপের কাছে গিয়ে যদি বা একটু বসত, এখন আর কেউ তাঁর ছায়া মাড়ায় না। সুরবালা সেজন্যে তাদের তিরস্কারও করে, যদিও জানে শিশুর মন রোগীর কাছে কিছুতে বসে না।

এমনি একটা সময়ে ক'দিন রোগ ভোগের পর বনমালী একদিন সুরবালাকে ডেকে বললেন, তোর সেই মামাশ্বশুরের মেয়ে না কে আছে বলছিলি সুরো, সেইখানেই বরং চেষ্টা কর্। আর তো কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু এই অসুখের সময় স্ত্রী না হলে···

সুরবালার মুখের সমস্ত রক্ত নিমিষের মধ্যে যেন কোথায় উড়ে গেল।

বনমালী বলতে লাগলেন, রাত্রিটা কি ক'রে যে কাটে আমিই জানি। তেষ্টায় মরে গেলেও এক ফোঁটা জল দেবার কেউ নেই। ছেলেমেয়েগুলোও এমনই হারামজাদা হয়েছে যে, কেউ একটা উঁকি মারে না। সত্যি বলছি তোকে, আমার আর বিয়ের বয়স নেই, সে ইচ্ছেও নেই। কিন্তু তাই ব'লে এমন বেঘোরেও তো মরতে পারব না। রাত্রে একা থাকি, যদি ম'রেও যাই, ভোর না হ'লে একটা খবর পর্য্যন্ত কেউ পাবে না।

সুরবালার সমস্ত শরীর থর থর ক'রে কাঁপছিল নিজেকে সামলাবার জন্যে সে দরজার একটা পাটি শক্ত ক'রে ধ'রে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল।

বনমালী আপন মনেই বলে চললেন, এখন বুঝছি, তোদের সকলের কথা অমান্য ক'রে ভালো করিনি। তা সে যা হবার হয়েছে, এখন তুই যা খুশী কর্, আমি বাধা দোব না।

সুরবালা কঠিনভাবে হাসলে। বললে, সে তো পরের কথা দাদা।

এখনই তো আর তোমার বিয়ে হ'তে পারে না। বউও কিছু এখনই এসে তোমার সেবায় ব'সে যেতে পারবে না।

নিজের অশোভন ব্যগ্রতায় লজ্জিত হয়ে বনমালী বললেন, না, না, সেই পরের কথাই বলছি।

সুরবালা নিঃশব্দে রান্নাঘরে ফিরে এল।

ভালো তরকারি রান্নার আগ্রহ আর তার নেই। কিন্তু এই কয় মাসের স্বাধীন এবং অবারিত গৃহিণীপনায় যে আনন্দের স্বাদ সে পেয়েছে তাকে বাঁচিয়ে রাখা যায় কি ক'রে? আনন্দসরোবরের জলে নেমে আবার সে ফিরে যাবে তার পুরাতন পচা নরককুণ্ডে?

সুরবালার মুখ কঠিন হয়ে উঠল।

বনমালী বিয়ে করবার জন্যে মনঃস্থির করেছেন। তাকে সে ভালো ক'রেই জানে। এর অর্থ, একবার তাঁর সেরে উঠতে যা দেরী। তারপর সব চেয়ে কাছে যে দিন পাওয়া যাবে সেই দিনেই বিবাহ স্থির হবে। তার পর নববধূ আসবে। হয়তো সে কাঞ্চনমালার মতো তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবে, নয়তো সদয় ব্যবহারই করবে। কিন্তু এই অনুগ্রহ অথবা নিগ্রহের অর্থ কি? উভয় ক্ষেত্রেই তার অবস্থা পরিচারিকা অথবা আশ্রিতা আত্মীয়ার উপরে তো আর উঠবে না।

হায় ভগবান! যদি সুরবালাকে বনমালীর আত্মীয়া ক'রেই পাঠিয়েছিলে, আরও নিকটতর আত্মীয়া ক'রে পাঠাওনি কেন? তা হ'লে বনমালীর এই অসুখে আরও বেশী শুশ্রূষা করা সম্ভব হ'ত। রাত্রে তাঁর নির্জ্জন রোগ শয্যায় একাকী উপস্থিত থাকাও অসম্ভব হ'ত না। কিন্তু এ কি!

সুর বালা বনমালীর বড় পিসিমার জা-এর মেয়ে। নিজের জা-ও নয়,

স্বামীর খুড়তুত ভায়ের স্ত্রী। স্বামীর মৃত্যুর পর সেই জা বনমালীর বড় পিসীমার আশ্রয়েই ওঠেন এবং আরও কিছুকাল পরে তাঁরই হাতে আট বছরের সুরবালাকে সমর্পণ ক'রে স্বামীর অনুগমন করেন। সেই থেকে সুরবালা তার জ্যাঠাইমার কাছে মানুষ। সেই সূত্রেই বনমালীর সঙ্গে আত্মীয়তা। সেই জ্যাঠাইমা আজ নেই। আছে সুরবালা আর বনমালী, আর সেই ছিন্ন তারে নতুন ক'রে জোড়া-তালি দেওয়া আত্মীয়তা। তারই উপর নির্ভর ক'রে বনমালীর রোগশয্যায় রাত্রি কাটানো চলে কি-না সংশয়ের বস্তু।

সমস্ত দিন ধ'রে সুরবালা কত কি ভাবলে, তার মাথাও নেই মুণ্ডও নেই। ছেলেগুলো কে যে পেট ভরে খেলে, আর কে খেলে না—চোখেও দেখার সময় পেলে না। খাওয়ার শেষে পিসিমা একটুখানি আচারের জন্যে গলা ভেঙ্গে ফেললেন, তবু পেলেন না। তিন বারের ওষুধ বনমালী দু'বারে খেলেন। আর সে নিজে ভাত বেড়ে সে ভাত হাঁড়িতেই ঢেলে রাখলে।

তারপরে সন্ধ্যাবেলায় অনেকদিন পরে চুলগুলো পরিপাটি ক'রে বাঁধলে। মুখে একটুখানি সাবানও গোপনে দিলে। রাত্রে ছেলেমেয়েদের খাইয়ে-শুইয়ে বনমালীর ঘরে এল।

তার পায়ের শব্দে চোখ মেলে বনমালী আশ্চর্য্যের সঙ্গে বললেন, সুরো?

সুরবালা নীচে মেঝেয় নিজের জন্যে একখানা মাদুর পাতছিল। সংক্ষেপে বললে, হুঁ।

—এইখানেই শুবি নাকি?

—হুঁ।

একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বনমালী বললেন, আমি বলতে পারছিলাম

না সুরো, কিন্তু জ্বর অবস্থায় একলা শুতে আমার বড় ভয় করে। তোর বৌদিকে কেবল স্বপ্ন দেখি। দেখে ভয় পাই। ভালোই হ'ল তুই এলি।

সুরবালা তাঁর মাথার শিয়রের বালিশটা ঠিক ক'রে দিয়ে ললাটে হাত বুলিয়ে বললে, এখন তো জ্বর নেই। ঘুমোও।

কোমল হাতের স্পর্শে তাঁর চোখ বন্ধ হয়ে এল। সুরবালার ঠাণ্ডা হাতখানি চোখের উপর রেখে জিজ্ঞাসা করলেন, কটা বাজে সুরো?

—কি জানি। দশটা বাজে বোধ হয়।

বনমালী আর কিছু বললেন না। শুধু ললাটে, মুখে, বুকে পরম আগ্রহে সেই শীতল হাতের স্পর্শ উপভোগ করতে লাগলেন।

সুরবালা কাঠের মতো শক্ত হয়ে সেইখানে ব'সে রইল।

* * * *

ভোরবেলায় ছেলেরা উঠে দেখলে, সুরবালা বারান্দায় একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়ে ঊর্দ্ধমুখে ব'সে আছে। মুখ মড়ার মতো শাদা, চোখে পলক পড়ে না, দুই কোণে দু'বিন্দু অশ্রু জমে আছে।

ছোট খোকা একটা ঠেলা দিয়ে ডাকলে, আমাকে খেতে দেবে না পিসি।

সে ডাকে সুরবালা একবার চমকে উঠল।

তারপর তাকে বুকে জড়িয়ে বললে, চল।

মাকড়সার জাল

ছেলের চিঠিখানা হাতে পড়ামাত্র দামড়িরামের চোখে এই কঠিন কর্কশ পৃথিবীর চেহারা যেন বদলে গেল। তার আলোহীন অনুজ্জ্বল ছোট ঘর, ঘরের মলিন দেয়াল, সমস্ত যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। এই চিঠিখানার প্রত্যাশায় পোনেরো দিন ধ'রে সে দিন গুণ্‌ছে। কোনো কাজে মন বসে না। কাজ ফেলে দিনের মধ্যে বহুবার কেবলই ফিরে ফিরে এসে দেখে যায় পিওন তার দরজার ফাঁক দিয়ে কোনো চিঠি ফেলে দিয়ে গেছে কি না। বারে বারেই হতাশ হয়ে ফিরে যায়, তবু আবার ফিরে আসে।

পোনেরো দিন পরে সেই বহুপ্রত্যাশিত চিঠি অবশেষে এল। তার ছেলের নিজের হাতে লেখা চিঠি! কথাটা ভাবতেও দামড়িরামের হাসি আসে এই তো সেদিন তাকে দেখে এল, এক ফোঁটা ছোঁড়া। এর মধ্যে কত বড় সে হয়েছে যে, একেবারে নিজের হাতে চিঠি লিখছে!

দামড়িরাম একলা ঘরে দাঁড়িয়ে নিজের মনেই হাসতে লাগলো।

কিন্তু সময় সম্বন্ধে তার হিসাব ঠিক থাকে না। যাকে সেদিন মনে করছে, আসলে তা পাঁচ বৎসরের ঘটনা। পাঁচ বৎসর আগে এমনি একটা পূজার সময় সে দেশে গিয়েছিল। সেটা হচ্ছে মুঙ্গের জেলায়। যেখানে মুঙ্গের জেলা দ্বারভাঙ্গার সঙ্গে এসে মিশেছে তারই কাছাকাছি। অত দূরে প্রতি বৎসর যাওয়ার সুযোগ তার হয় না। সে রকম ছুটিও পায় না। সে জন্যে গত পাঁচটা বৎসরে আর সে যেতেও পারেনি।

এই পাঁচটা বৎসর তার কাছে বিভিন্ন রকম মনে হয়। কখনও এত

দীর্ঘ মনে হয় যে, ভাবতেও তার প্রাণটা হাঁফিয়ে ওঠে। ক্লান্ত দিনের শেষে বাসায় ফিরে রাত্রের খাবার তৈরী করতে করতে উনানের আলোয় যাদের মুখ সে মনে করবার চেষ্টা করে, তাদের মুখ মনে পড়ে না। আবার কখনও মনে হয়, এই তো সেদিন। ক্ষুদ্র রঘুয়া উলঙ্গ দেহে বিরাটকায় মহিষটাকে ঠেঙাতে ঠেঙাতে চরাতে নিয়ে গেল। তার নিজের সামনে বড়শিতে দুটো টাটকা কচি ভুট্টা পুড়ছে। লছমিয়া উঠানের মধ্য দিয়ে আসতে আসতে তার দিকে চেয়ে অকারণেই হাসলে।

এই তো সেদিন!

তবু সে পাঁচ বৎসরের কথা। সেদিনের ক্ষুদ্র রঘুয়া আজ নিজের হাতে বাপকে চিঠি লেখে! কে জানে লছমিয়া আর তেমন ক'রে অকারণে হাসতে পারে কি না!

পাঁচ বৎসর তো কম নয়।

এ বারে গিয়ে হয় তো সে আর রঘুয়াকে ধূলায়-ধূসর নগ্ন দেহে দেখতেই পাবে না। সকালে তার পাঠশালা, দুপুরে ক্ষেতের কাজ। কে জানে সে কত বড় হয়েছে!

দামড়িরাম চিঠিখানা উল্‌টে-পাল্‌টে দেখতে লাগলো। বড় বড় বাঁকা বাঁকা অক্ষর। বানান সর্ব্বত্র ঠিক নেই। দুই একটা শব্দ মাঝে মাঝে ছেড়ে গেছে। ভুলে-ভরা চিঠির অক্ষরগুলো যেন শিশু রঘুয়ার মতো তার চোখের সামনে নৃত্য করতে লাগলো।

চিঠির প্রথমেই রঘুয়া প্রণাম দিয়েছে, শেষে আর একবার। আর মধ্যখানে লিখেছে, এবারে যখন দামড়িরাম যাবে তার জন্যে লাল-সাটিনের পা-জামা, নীল ফুল-তোলা সাটিনের আচকান এবং মাথায় জরির টুপি নিশ্চয় চাই।

বাপরে বাপ!

একেবারে সাটিনের আচকান, পাজামা আর জরির টুপি!

কিন্তু তখনই তার চোখের সুমুখে ভেসে উঠল, দূরে যতদূর দৃষ্টি চলে, কপির ক্ষেত নীলে ভাসছে। তার উপর ঘনিয়ে আসছে ধূসর পাহাড়ের ছায়া। আকাশে অস্তরাগের বর্ণচ্ছটা। আগে হরিণশিশুর মতো লাফিয়ে-লাফিয়ে চলেছে রঘুয়া। পিছনে সে আর লছমনিয়া। রঘুয়ার দিকে চেয়ে ওদের দুজনেরই একটা অপূর্ব্ব আনন্দে গতি মন্থর হয়ে আসছে। ওরা চলেছে সহরে, বাঙ্গালীবাবুর বাড়ীতে পুজো দেখতে···

দামড়িরাম স্থির করেছে, আর কিছু হোক না হোক, রঘুয়ার পোষাক একটা কেনাই চাই।

তার পক্ষে ব্যাপারটা খুব কষ্টকরও নয়। বলতে গেলে, রোজগার তার ভালোই। কোন্ একটা আফিসে সে বেয়ারাগিরি করে। সেখানে টাকা কুড়ি-বাইশ পায়। এর উপর সকালে খবরের কাগজ ফেরী করে। তাতেও আর গোটা বিশেক টাকা হয়। এর উপর এবং সেইটেই বড় আয়, তার কিছু মহাজনী কারবার আছে। আফিসের যে সমস্ত বাবু এবং সাহেব রেস খেলে, মাসের ১৫ তারিখের পর থেকেই তাদের টাকার দরকার হয়। একটু চড়া সুদে তাদের সে টাকা ধার দেয় এবং মাস-কাবারে মাইনে পেলেই সুদ সমেত টাকাটা পেয়ে যায়। পোনেরো তারিখের পরে আবার ধার দেয়। এমনি ক'রে তার রোজগারের টাকা সুদে আসলে বেশ বেড়ে যায়।

দুপুর এবং বিকেল সে আফিসেই বদ্ধ থাকে। কিন্তু সকালে তার

অবসর আছে। ভোর তিনটেয় উঠে তাকে খবরের কাগজের আফিসে আফিসে ছুটতে হয়। সেখান থেকে তার প্রয়োজনমত কাগজ নিয়েই রাস্তায় হাঁটাহাঁটি আরম্ভ করে। তারপরে পোষাকের দোকান খুললেই সে ওরই মধ্যে বিশবার শো-কেসের সামনে এসে দাঁড়ায়। সাজানো পোষাকগুলোর দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে দেখে, কোন পোষাকটা রঘুয়াকে কেমন মানায়।

পূজোর তখনও মাস ছয়েক দেরী। দামড়িরামের পক্ষে ততদিন ধৈর্য্য ধারণ ক'রে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠল।

খামের চিঠিখানা সব সময়ে তার শততালিযুক্ত মলিন পাঞ্জাবীর পকেটেই থাকে। অবসর পেলেই সেটা বার করে পড়ে, পরিচিত কাউকে পেলেই তাকে দেয়।

—দেখো তো ভেইয়া, কেয়া লিখা।

—কোন লিখা ?

দামড়ি সগর্ব্বে বলে, মেরে লেড়কা।

লোকটা চিঠি পড়ে সহাস্যে ফেরৎ দেয়।

বলে তব কেয়া! লাগ যাও। জাস্তি তো নেহি, খালি সোয়াটিনকো আচকান ঔর পায়জামা।

মুচকি হেসে দামড়ি বলে, ব্যস্, উ তো ঠিক হ্যায়। লেকিন মিলতা কাঁহা ?

—হাম কেয়া জানে। পুছো কিস্‌কো।

সবই ঠিক আছে। আচকান আর পায়জামা। দামড়িরাম যাকে পায় পুছিয়া বেড়ায়, কিন্তু সঠিক কেউ ব'লতে পারে না। সবাই বলে, দেখ, দোকানে দোকানে জিজ্ঞাসা কর। ক'লকাত্তা সহরে

বাঘের দুধ পাওয়া যায়, সোয়াটিনের আচকান পায়জামা তো সামান্ত ব্যাপার!

দামড়িরাম একটা কথা বুঝলে যে, ইতিপূর্ব্বে তার পরিচিত আর কেউ তার ছেলের জন্তে এই মহামূল্য পোষাক কেনেনি। কিনলে, ঠিক কোথায় পাওয়া যায় নিশ্চয়ই বলতে পারতো। সেই কথা ভেবে তার মন গর্ব্বে এবং আনন্দে আরও ফুলে ওঠে।

সত্যি কথা বলতে কি, এই ক'দিনের মধ্যেই ওর চেহারা, চাল-চলন সব এমন বদলে গেল যে, বন্ধুরা ভয় করতে লাগলো, মাথা না খারাপ হ'য়ে যায়।

কিন্তু ঠিক মাথা খারাপের লক্ষণও নয়।

আগে সে যতখানা কাগজ নিত, এখন তার চেয়ে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। হাঁকছে আরও জোরে; ছুটোছুটি অনেক বেড়েছে। এমন কি দুপুরে টিফিনে যে এক ঘণ্টা সময় পায়, তারও মধ্যে যতগুলো পারে টেলিগ্রাম বিক্রি করে। এমন কি' ক'লকাতায় যখন ট্রাম পুড়ছে, গুলি চলছে, লোক মরছে, তখন যে সব জায়গায় কেউ যেতে সাহস করে না, সে সব জায়গায় সে নির্ভয়ে চলে যায়।

এমনি ক'রে তার আয় আরও বেড়ে গেল।

দামড়িরাম অবিশ্রান্ত খাটে, চরকির মতো ঘোরে, আর যাকে পায় তাকেই জিজ্ঞাসা করে, সোয়াটিনের আচকান আর পায়জামা কোথায় পাওয়া যায়। জরির টুপির খবর সে জানতে পেরেছে।

অবশেষে অবশিষ্ট খবরও পেল। একজন তাকে সন্ধান দিলে, কোথায় তা পাওয়া যেতে পারে এবং কত বা তার দাম পড়তে পারে।

অন্ত সময় হ'লে দাম শুনে সে ভড়কে যেত। কিন্তু কি যেন ওর

হ'য়েছে। ডাইনে বাঁয়ে ধ্যানমৌন ধূসর পাহাড়, পদনিম্নে দিগন্তবিস্তৃত ঘন সবুজ কপির ক্ষেত, মাঝ দিয়ে আঁকা বাঁকা সরু আল পথ, তারই উপর সাটিনের পোষাক পরা রঘুয়া,—এই যখন সে কল্পনা করে তখন টাকা যেন আর তার কাছে টাকা বলে মনে হয় না।

কিন্তু সাটিন কিনতে গিয়ে সে পড়লো মুস্কিলে। রঘুয়ার মাপ তার কাছে নেই। মাপ সে পাঠায়নি, পাঠাবার প্রয়োজনই বোধ করে নি।

হতবুদ্ধির মত সে চারিদিকে চাইলে।

দোকানে আরও কতগুলি ছেলে আছে নানা বয়সের। তারাও এসেছে কিনতে। তাদের দিকে চেয়েও একটা আন্দাজ করবার চেষ্টা করলে। কিন্তু কিছুতেই ঠিক করতে পারলে না। যেটির দিকে চায়, মনে হয় ওরই মতো হবে বোধ হয়।

অনেকক্ষণ তাদের দিকে চেয়ে ও দোকান থেকে বেরিয়ে এল। কোমরে গেঁজলেতে তার নোটের তাড়া। অনেক আশা নিয়ে এসেছিল সে কিনতে। কিন্তু হ'ল না।

মনটাই তার খারাপ হয়ে গেল।

অবশ্য এখনও অনেক সময় আছে। মুঙ্গের জেলা খুব বেশী দূরে নয়। আজকেই যদি সে চিঠি দেয়, হপ্তাখানেকের মধ্যে মাপ চলে আসবে। বড় জোর দশ দিন লাগবে। তাই সে করবে। তবু প্রথম চেষ্টাতেই নিরাশ হয়ে মনটা তার খারাপ হয়ে গেল।

একবার হাসিও এল। কত দিন হ'ল রঘুয়ার চিঠি এসেছে, কিন্তু

মাপের কথাটা একবারও তার মনে হয়নি। আশ্চর্য্য! রঘুয়া না হয় ছেলেমানুষ, কিন্তু সে তো আর ছেলেমানুষ নয়।

বাসায় ফেরামাত্র একটা হট্টগোল আরম্ভ হ'ল,—

—কি এনেছিস দেখি! দেখি!

দামড়িরাম বুড়ো আঙ্গুল নাড়িয়ে বললে, কিছুই না।

—আরে মাপে কি হবে, তোর ছেলে তোর আন্দাজ নেই?

লজ্জিত হাস্যে দামড়িরাম বললে, পাঁচ বছর দেখি নি।

কথাটা ভাববার মতো।

কিন্তু বন্ধুরা নিরুৎসাহ হ'ল না। পাশের একটা নয় দশ বছরের ছেলেকে দেখিয়ে বলল, এই রকমই হবে আর কি!

দামড়িরাম তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে দেখলে। বললে, ওর চেয়ে লম্বা হবে। স্বাস্থ্যটা ভালো কি না।

বন্ধুরা বললে, তাহ'লে ঐটের মতো?

ব'লে আর একটি ছেলের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখালে।

দামড়িরাম ভেবে বললে, আর একটুকু ছোট হবে। দেখি, সোজা হয়ে দাঁড়া দেখি?

ছেলেটি হাসতে হাসতে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

—হ্যাঁ, আরেকটুকু ছোটই হবে বোধ হয়। ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না।

দামড়িরাম আবার লজ্জিতভাবে হি-হি ক'রে হাসলে। কিন্তু তখনই উৎসাহভরে হাতে তালি বাজিয়ে বললে, কুছ পরোয়া নেই ভাই। চিঠি ভেজ দিয়েছি, হপ্তার মধ্যে মাপ আযায়েগা।

কিন্তু মনটা তবু কেমন খচ্ খচ্ করতে লাগলো।

দামড়িরাম চিঠি দিলে, কিন্তু পোনরো দিনের মধ্যেও তার উত্তর না পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো।

নিজে সে খবরের কাগজ ফেরি করে। সকাল-বেলাতেই একখানা কাগজ ঊর্দ্ধে তুলে চীৎকার করতে করতে ছুটে, হো গিয়া হ্যায়, হো গিয়া হ্যায়!

কিন্তু কি যে হয়ে গেল, সে নিজেও জানে না।

যতদিন যায়, চিঠি আসে না, আর সে মুষড়ে পড়ে। এখন আর সে তেমন উৎসাহভরে জোরে জোরে হাঁকতে পারে না।

বেনেটোলার মোড়ে একটা মেসে সে কাগজ দেয়। ভদ্রলোক ঘণ্টাখানেকের জন্তে কাগজখানা নেন, পড়েন, তারপরে আবার ফেরৎ দেন। দামড়িরাম কাগজখানা আবার পুরো দামে বিক্রি করে। তার সুবিধা এই যে, আধখানা কাগজের দাম সে শুধু শুধুই লাভ করে।

দামড়িরামের কাজ হয়েছে, প্রথম কাগজখানাই সে ছুটতে ছুটতে নিয়ে গিয়ে ভদ্রলোককে দেয়। অত ভোরে ভদ্রলোকের সব দিন হয় তো ঘুম ভাঙে না। যে-দিন ভাঙে, দামড়িরাম কাগজের বাণ্ডিল বগলে নিয়ে তাঁর দরজার চৌকাঠে উঁচু হয়ে বসে।

বলে, আগে হামকো মুঙ্গেরকা খবরঠো বাতাইয়ে তো।

মুঙ্গেরের খবর কোনদিন থাকে, কোনদিন থাকে না। ভদ্রলোক তাকে প'ড়ে-প'ড়ে শোনান: কোথাও উন্মত্ত জনতা রেল লাইন তুলছে, টেলিগ্রাফের তার কাটছে, রেল-ষ্টেশন, থানা আক্রমণ করছে,—বিনিময়ে গুলী খাচ্ছে, গ্রেপ্তার হচ্ছে, পাইকারী জরিমানা দিচ্ছে। সব দিকে

ট্রেণ চলছে না, ডাক যেতে দেরী হচ্ছে, আরও কত কি। এই সবই অবশ্য তার মুঙ্গের জেলায় নয়। এক একদিন এক এক জায়গার খবর। কিন্তু এর মধ্যে মুঙ্গেরও আছে।

যে-দিন মুঙ্গেরের কোনো খবর থাকে না, সে-দিন দামড়িরাম খুশী হয়। বলে, আর সব ঠিক হো গিয়া হ্যায়, না বাবুজী ?

বাবুজী তামাক টানতে টানতে বলেন, কি জানি বাবা।

দামড়িরাম বিজ্ঞের মতো বলে, উ তো ঠিক বাৎ বাবুজী। হামকো মালুম হোতা, পূজাকা বিচমে সব ঠিক হো যায়ে গা।

সে কাগজ আকাশে তুলে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে পড়ে।

কিন্তু যে-দিন মুঙ্গেরের খবর থাকে, সে-দিন সে দ'মে যায়।

—তব তো বহুৎ মুস্কিলকা বাৎ হ্যায় বাবুজী !

বাবুজী সাড়া দেন না।

দামড়িরামের বুকে যেন একটা জগদ্দল পাথর চেপে বসে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

সে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে। হাতের কাগজগুলো তার কাছে ভারি মনে হয়। প্রভাতের সোনালী আলো, পথে-পথে ছেলেমেয়ের হুড়াহুড়ি কিছুই তার ভাল লাগে না। হাতের কাগজগুলো পরিচিত অন্য হকারকে দিয়ে সে বাসায় ফিরে আসে।

বিস্মিত হকার বলে, কেয়া হুয়া দামড়ি ?

—তবিয়ৎ ঠিক নেহি হ্যায়।

কিন্তু বাসায় ফিরেও সে নিশ্চিন্ত হতে পারে না। তার বুকের মধ্যে কি যেন একটা তোলপাড় করতে চায়, কিন্তু তার পথ পাচ্ছে না। তাই কোথাও তাকে সুস্থির হতে দিচ্ছে না।

সে একবার শোয়, একবার উঠে বসে। কখনও বা সঙ্কীর্ণ ঘরের মধ্যে অস্থিরভাবে পাইচারী করে। কিন্তু কিছুতেই শান্তি পায় না।

অবশেষে পাড়ায় বাঁকের মুখে দাওয়ায় বসে বাবুরা যেখানে চায়ের পেয়ালা সামনে নিয়ে খবরের কাগজ পড়ে, সেইখানে গিয়ে নিঃশব্দে একপাশে বসে। তাদের উদ্দাম রাজনৈতিক আলোচনা শোনে। কিন্তু যা শোনে, তাতে তার বুকের রক্ত একেবারে শুকিয়ে যায়।

তবু নিষ্কৃতি নেই।

খবরের কাগজ অন্য হকারকে দেওয়া যায়। লাভটা নাই পেল, আসল দামটা ফেরৎ পাবে। কিন্তু আপিসের কাজে তো আর বদলি চলবে না। সে কাজ তার নিজেকেই করতে হবে।

দামড়িরাম মাথায় দু'ঘটি জল ঢেলে হোটেলে যায়। সেখানে দু'টি খেয়ে আপিস যাবে।

অবশেষে পূজা এসে গেল। মধ্যে আর দু'টি দিন বাকী।

রঘুয়ার কোন চিঠিই এল না। না চিঠি, না মাপ। কিন্তু তার জন্যে লাল সাটিনের পায়জামা, ফুলতোলা নীল সাটিনের আচকান, এবং জরির টুপী দামড়িরাম কিনবেই।

যে ছেলেটিকে মাথায় রঘুয়ায় মতো হবে বলে তার মনে হ'ল, তারই মাপে সে কিনলে। হয় তো একটু বড় বড় হবে, তা হোক। কিছুদিন পরতে পারবে। ওদের এখন বাড়ার বয়স। এ মাসের জামা ছ'মাস পরে আর গায়ে হয় না।

দাম লাগলো অনেকগুলো টাকা। কিন্তু তা গায়ে লাগলো না।

বাসায় গিয়ে মলিন ঘরের স্তিমিত আলোকেও সেগুলো খুলতেই চোখের সামনে যেন ঝলমল ক'রে উঠলো। রঘুয়ার মুখ তার ভালো মনে পড়ে না। সে যে কত বড় হয়েছে তাও জানা নেই। তবু এই সুন্দর ঝলমলে পোষাকে তাকে কল্পনা করতেই দামড়িরামের মনও আনন্দে ঝলমল ক'রে উঠল।

ষ্টেশনে সে রোজই গিয়ে খবর নেয়। ট্রেণের গোল এখনো ভাল ক'রে মেটেনি সে খবরও সে জানে। কিন্তু তবু তাকে যেতে হবেই। পূজার ছুটির দু'দিন আগেই এক মাসের জন্যে বিনা মাইনের ছুটি নিয়ে সে বেরিয়ে পড়লো।

ছুটির দু'দিন আগে, তবু ভিড় বেশ। কিন্তু ওরই মধ্যে কোন রকমে একটু বসবার জায়গা সে ক'রে নিল এবং বর্দ্ধমানে পৌছুবার আগেই পাশের লোকটির সঙ্গে বেশ আলাপ জমিয়ে নিলে। সে যাবে আরও দূরে, পাটনা ছাড়িয়ে।

লোকটি ভালো। মেছুয়াবাজারে তার কয়লার দোকান আছে। রামজীর কৃপায় মন্দ চলে না। ছেলে লায়েক হয়েছে। ছ'মাস ধরে তাকে দোকান চালানো শিখিয়ে, সে এখন দেশে চললো। এখন আর ফিরবে না।

দামড়িরামের রঘুয়ার কথা মনে হ'ল। মনে হ'ল সে-ও বুড়ো হয়ে আসছে, শরীরে আর বল নেই তেমন। মাঝে মাঝে মাথা ঘোরে। একটুতে ক্লান্ত হয়। তারও যেন বিশ্রাম নেবার সময় হয়ে আসছে।

মনে হ'ল রঘুয়াও তার লায়েক হয়েছে। নিজের হাতে সে চিঠি লিখতে পারে। ন'দশ বছর বয়সও তো নিতান্ত কম নয়। স্থির করলে ফেরার সময় তাকে ক'লকাতা নিয়ে আসতে হবে। লেখা

পড়া যা হয়েছে ওতেই হবে। এবার সাইকেল চড়া শেখাতে হবে। কোন কাগজের আপিস কোথায় চেনাতে হবে। সঙ্গে ক'রে ক'রে ঘোরাতে হবে। মাঝে মাঝে খবরের কাগজও বিক্রী করাতে হবে। এ সবেও সময় কম লাগবে না। তার শরীর মজবুৎ থাকতে-থাকতেই এ সব শেখানো দরকার।

না, আর বিলম্ব করা চলবে না।

খবরের কাগজ বিক্রীতে 'নফা' কম নয়। বহুলোক শুধু খবরের কাগজ বিক্রী ক'রে 'লাল' হয়ে গেছে। নসিবে থাকলে রঘুয়ার পক্ষে লাল হওয়াও অসম্ভব নয়।

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। অন্ধকারের মধ্য দিয়ে হু-হু শব্দে ট্রেণ ছুটে চলেছে।

দামড়িরামের তন্দ্রা আসছিল। আশা, আনন্দ, স্বপ্নে ভরা সুন্দর তন্দ্রা। তারই মধ্যে ট্রেণ চলেছে তার নিজের আনন্দে।

যখন ট্রেণ কিউলে পৌছুলো তখন পাশের সেই কয়লাওয়ালার ধাক্কায় তার ঘুম ভাঙ্গলো। আর কয়েকটি ষ্টেশন পরেই তার নিজের গ্রামের ষ্টেশন।

কিন্তু উঠতে চেষ্টা ক'রেও দামড়িরাম উঠতে পারে না। তার মাথাটা কে যেন প্রচণ্ড জোরে বেঞ্চের উপর চেপে ধরেছে। কে যেন তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে।

তার প্রবল জ্বর। চোখ রক্তবর্ণ। কিন্তু জ্ঞান আছে।

ট্রেণের সহযাত্রীরা ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

—সঙ্গে কেউ আছে ?

কেউ নেই। কিন্তু ভরসা আছে, ষ্টেশনে নামিয়ে দিলে সে যেতে

পারবে। ষ্টেশনের পাশেই তার গ্রাম। চেষ্টা করলে হেঁটেই যেতে পারবে। নয় তো কারও কাঁধে ভর করে। তার লোকের অভাব হবে না।

জিনিসপত্র সঙ্গে বেশী কিছু ছিল না। সহযাত্রীরা ধরাধরি ক'রে তাকে নামিয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে তার পোঁটলাটিও। তার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে, লাল সাটিনের পায়জামার একটা প্রান্ত।

কয়লাওয়ালা সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলে, সাহেব-জাদাকো ?

দামড়িরাম হেসে বললে, হ্যাঁ জি। মেরে গরিব-জাদাকো।

সে তখন ঠক ঠক ক'রে জ্বরের ধমকে কাঁপছে। দাঁড়াবার সামর্থ্য নেই। ট্রেণ চলে গেল। পুটলিটিকে কোলে ক'রে সেইখানে প্ল্যাটফর্ম্মের উপরই ব'সে পড়লো।

ষ্টেশনের লোকেরা ধরাধরি ক'রে তাকে ষ্টেশনে নিয়ে এসে একটা বেঞ্চে শুইয়ে দেয়। তার বাড়ীতে খবর দিতে আপনার লোকরা ছুটতে ছুটতে এল। আলুথালু বেশে এল লছমনিয়া।

তখনও দামড়িরামের জ্ঞান আছে।

পুঁটলির একপ্রান্তে উঁকি দিচ্ছে লাল সাটিনের পায়জামা। সেই ইঙ্গিত ক'রে লছমিয়াকে বললে, রঘুয়াকো।

রঘুয়ার পায়জামা দেখবামাত্র লছমনিয়া আর নিজেকে সম্বরণ করতে পারলে না। একটা অব্যক্ত শব্দ ক'রে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেল।

দামড়িরাম প্রথমটা লাল চোখ মেলে সকলের দিকে অবাক হয়ে চাইতে লাগলো। কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতে তার দেরি হল না। পুঁটলিটা হাত থেকে নীচে পড়ে গেল।

একুশ দিন পরে যখন তার জ্ঞান হ'ল, তখন সে নিজের ঘরে মলিন কাঁথায় শুয়ে।

চারিদিকে চোখ মেলে চেয়ে কি যেন মনে করবার চেষ্টা করলে, কিন্তু পারলে না। শ্রান্তভাবে চোখ বন্ধ করলে।

ঘরের কোণে একটি মাকড়সা নূতন শিকারের জন্যে তার জালখানা গভীর মনোযোগে রিপু করছিল।

একাকিনী

ডক্টর ধ্রুবেশ্ দত্ত বিলেত থেকে এম, আর, সি, পি, ডিগ্রী নিয়ে ফিরে এল যেদিন, তার ছ'মাস পরেই ক'লকাতার মেডিকাল কলেজে চাকরী পেল। যারা ধ্রুবেশকে চেনে, তারা বলবে এতে খুশি হবার কিছু নেই। ক'লকাতা মেডিকাল কলেজের সমস্ত পরীক্ষায় সে ফার্ষ্ট হয়েছে। বিলেতের পরীক্ষার ফলও তার খুব ভালো। সে যদি স্বাধীনভাবে প্র্যাকটিস করতো তাহ'লে আরও অনেক বেশী টাকা রোজগার করতে পারতো। নামও হোত ঢের বেশী।

কিন্তু ধ্রুবেশকে যারা জানে, তারা বলবে, এই ঠিক হয়েছে। স্বাধীন-ভাবে প্র্যাকটিস করতে গেলে যে সময়ানুবর্ত্তিতা, অর্থের প্রতি আকর্ষণ এবং আরও আনুষঙ্গিক অনেক কিছুর প্রয়োজন, তা তার মোটেই নেই। সে ঢিলাঢালা স্বভাবের লোক। প্র্যাকটিস করার যোগ্যতা তার নেই। তার যোগ্যতা গবেষণা কাজে। আহার-নিদ্রা ভুলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে পড়ে যেতে পারে, কিম্বা ল্যাবরেটরীতে গবেষণা করতে পারে। এ কাজে যে অবসরের প্রয়োজন, তা চাকরীতেই মিলতে পারে। সেই কথা বুঝেই সে মেডিকাল কলেজে চাকরী নিলে।

তার অন্তরঙ্গ বন্ধুরা বললে, ধ্রুবেশ ভালোই করেছে। তার কাছে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অনেক প্রত্যাশা আছে।

চাকরী পেয়ে ধ্রুবেশ মেডিকাল কলেজের কাছাকাছি একটা ছোট বাড়ী নিলে। সে অবিবাহিত। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মুখ চেয়ে বিবাহ

করবে না স্থির করেছে। নিজের সমস্ত জীবন এবং সমস্ত মনোযোগ অখণ্ডভাবে গবেষণাতে নিয়োগ করাই তার সঙ্কল্প। সুতরাং ছোট বাড়ীই তার যথেষ্ট।

উপরে তিনখানি ঘর। একটিতে সে শোয়, একটি তার ল্যাবরেটরী, আর একটা প'ড়েই আছে। নিচে একটা বসবার ঘর আছে। কিন্তু সেখানে বসে কমই। তার বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা অল্প। যারা দেখা করতে আসে তাদের সংখ্যা আরও অল্প। সুতরাং নিচের বসবার ঘরে নামবার প্রয়োজন কচিৎ হয়। বিশেষ তার সময়ের বেশির ভাগ কাটে মেডিকাল কলেজেই।

এই ছোট বাড়ীতে একটি ঠাকুর এবং একটি চাকর নিয়ে তার সংসার।

ঠাকুর যে খুব ভালো রাঁধে তা নয়। চাকর যে ঘর-দোর খুব পরিষ্কার রাখে তাও বলা যায় না। কিন্তু ধ্রুবেশের সুবিধা এই যে, সে রান্নার জহুরী নয়। ক্ষুধার সময় যা-হোক কিছু পেলেই তার শান্তি। এবং ঘর-দোর যতই অপরিষ্কার থাক, খেটেখুটে এসে বাইরের দিকের বারান্দায় ইজি চেয়ারটা পেতে বসতে পেলেই তার শান্তি।

এমনি করে তার দিন চলে।

ইতিমধ্যে একটা অঘটন ঘটলো।

শীতের রাত্রি। একে অন্ধকার রাত্রি, তায় ব্ল্যাক-আউট। তার উপর ফিস্‌ফিস্ বৃষ্টি পড়ছিলো। পথ বিজন। দোকান পাট বন্ধ। ক'লকাতা সুখসুপ্ত। কোনো বাড়ীর খড়খড়ির ফাঁক দিয়েও এতটুকু

আলো আসছিল না। ব্যাফ্‌ল্‌ ওয়ালের অন্তরালে ভিখারীরাও নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছিল।

কলেজে একটা জরুরী কাজ সেরে ধ্রুবেশ গলি পথে বাড়ী ফিরছিল। কাছেই বাড়ী। টর্চ্চের আলোয় পথ দেখে দেখে হেঁটেই আসছিল।

হঠাৎ সামনের খোলা জমিটার ওদিকের কোণে মনে হ'ল শাদা মতো কি যেন একটা পড়ে রয়েছে।

প্রথমে সে খেয়াল করলো না। কিন্তু আবার একবার টর্চ্চের আলোটা পড়তেই মনে হ'ল, কি ওটা?

নিজের বাড়ীর সামনে এসে ধ্রুবেশ দাঁড়ালো। সেখান থেকে জায়গাটা দূরে নয়। দরজার কড়া নাড়বার আগে আর একবার আলোটা ফেললে।

শাদা মতো কি একটাই বটে। পুঁটলি নয়, তার চেয়েও বড়।

ধ্রুবেশ কড়া নাড়তেই চাকর চোখ মুছতে মুছতে এসে দরজাটা খুলে দিলে। কিন্তু ধ্রুবেশ তখনই বাড়ীর ভিতর ঢুকলো না। আর একবার সেদিকে আলোটা ফেললে।

চাকরটাকে বললে, দেখ্‌ তো, ওটা কি পড়ে রয়েছে?

একে মাঘের শীত। তায় কনকনে হাওয়া দিচ্ছে এবং ফিস্‌ফিস্‌ বৃষ্টি। এমনতরো আবহাওয়ায় তার কৌতূহলও মিইয়ে গিয়েছিল। তবু বাধ্য হয়ে যেতে হ'ল।

কিন্তু গিয়ে যা দেখলে, তাতে তার কণ্ঠস্বর বন্ধ হয়ে গেল।

কোনোক্রমে বললে, শিগগির আসুন।

ধ্রুবেশ গিয়ে দেখে একটি স্ত্রীলোক। সর্ব্বাঙ্গে কাপড় জড়িয়ে পড়ে আছে। দেহ কাঠের মতো শক্ত হয়ে গেছে।

চাকরটা ফিস ফিস করে বললে, মরে গেছে নাকি ?

ধ্রুবেশ উত্তর দিলে না। সেইখানে হাঁটুগেড়ে বসে অতি সন্তর্পণে প্রথমে নাড়ী, তারপরে বুকের স্পন্দন পরীক্ষা করলে।

বললে, মরেনি। এক কাজ কর দিকি। একে ধরাধরি করে বাড়ীতে নিয়ে যেতে হবে।

তাই হ'ল।

ধ্রুবেশের কাছে ব্র্যাণ্ডি ছিল। চাকরটাকে একটু দুধ গরম ক'রে আনতে বললে।

ঘরের উজ্জ্বল আলোয় ধ্রুবেশ দেখলে, মেয়েটির বয়স বেশি নয়, কুড়ি-একুশ। হাতে দু'গাছি পিতলের চুড়ি। পরণে মিলের আটপৌরে শাড়ি। সিঁথিতে সিন্দুর নেই। বিধবাও হতে পারে, কুমারীও হতে পারে।

অনেক চেষ্টায় বহুক্ষণ পরে তার জ্ঞান হ'ল। কিন্তু খুব দুর্ব্বল। তখনও তার কথা বলবার শক্তি নেই। সে যে কে, কোথা থেকে আসছে, এই বর্ষণসিক্ত শীতের রাত্রে কেনই বা মাঠের মধ্যে পড়ে ছিল, কিছুই জানা গেল না। কেবল বোঝা গেল, মেয়েটি ভদ্রঘরের।

একখানি ঘর ধ্রুবেশের বাড়তি ছিল। সে রাত্রের মতো সেইখানে তার শোবার ব্যবস্থা করা হ'ল।

পরের দিন সকালে ধ্রুবেশের কলেজে ডিউটি ছিল। একটু চা খেয়েই সে বেরিয়ে গেল। মেয়েটির সঙ্গে তার দেখা হ'লো না। শুধু চাকরকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলে, মেয়েটি উঠেছে, চা খাচ্ছে।

কলেজ থেকে ধ্রুবেশ যখন ফিরলে তখন বেলা বারোটা বেজে গেছে। স্নান ক'রে এসে সে খেতে বসলো।

ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলে, মেয়েটির খাওয়া হয়েছে ?

—না, বাবু।

—সে কি ! এখনও খাওয়া হয়নি ?

—কিছুতেই খেতে চাইলেন না বাবু। বললেন, আপনার খাওয়া হলে পরে খাবেন।

ধ্রুবেশ আর কিছু বললে না।

খাওয়ার পরে ধ্রুবেশের একটু দিবানিদ্রার অভ্যাস আছে,—পোনেরো-কুড়ি মিনিটের জন্যে। কিন্তু গত রাত্রে ভালো ঘুম না হওয়ায় নিদ্রা থেকে যখন উঠলো, তখন তিনটে। পশ্চিমের জানলার বহু রঙের কাচের ভিতর দিয়ে বহু রঙের আলো এসে পড়েছে তার বিছানায়।

এত দেরী তার বড় একটা হয় না।

কিছুকাল থেকে সে একটা কঠিন গবেষণায় ব্যস্ত আছে। বাতজ্বরের পর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের যে হৃদ্‌রোগ হয়, তাই তার গবেষণার বিষয়। এখনও পর্য্যন্ত এই রোগের কারণ নিশ্চয় ক'রে জানা যায়নি। কেউ বলেন, Streptococcus rheumaticus, কেউ বলেন অণুবীক্ষণেও দেখা যায় না এমনতরো সূক্ষ্ম একটা virus, কেউ বলেন allergy এর জন্যে দায়ী। ধ্রুবেশ এই নিয়েই গবেষণা করছে।

ধ্রুবেশ ধড়মড় ক'রে বিছানা ছেড়ে উঠলো।

এই সময়টা সে নিজের ল্যাবরেটরীতেই কাজ করে। তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে তারই জন্যে প্রস্তুত হ'ল।

তার সাড়া পেয়ে চাকরটা এসে দোরগোড়ায় দাঁড়ালো।

ধ্রুবেশ বললে, ঠাকুরকে চা তৈরী করতে বল।

একটু ইতস্ততঃ করে চাকরটা বললে, ঠাকুর তো নেই বাবু।

—কোথায় গেল ?

—কাপড় কিনতে।

—এই সময় কাপড় কিনতে ? তুই চা তৈরী করতে পারিস ?

দরজার অন্তরালে মুখ সরিয়ে নিয়ে গিয়ে সে লজ্জিতভাবে হাসলে। উড়িষ্যা থেকে এসে এই ক' বছরে সে অনেক কিছু শিখেছে। কিন্তু চা তৈরীটা তার কিছুতেই আসে না। হয় হালকা হয়, নয় কড়া হয়। হয় চিনি বেশী হয়, নয় কম হয়। কিছুতেই ঠিকমতো হয় না।

হঠাৎ ধ্রুবেশের মেয়েটির কথা মনে পড়লো।

ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করলে, কি করছে রে ?

—পড়ছেন।

ধ্রুবেশ আর কিছু বললে না। এপ্রনটা গায়ে দিয়ে ল্যাবরেটরী চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে ঠুকঠাক শব্দে চমকে পিছন ফিরে দেখে, মেয়েটি এসে দাঁড়িয়েছে। তার এক হাতে চায়ের পেয়ালা, অন্য হাতে খাবারের থালা।

ধ্রুবেশ চাইতেই সে জিজ্ঞাসা করলে, এগুলো কোথায় রাখব ?

উঁচু টুলটা থেকে ধ্রুবেশ নেমে এল।

ঘরের এক পাশে একটা ইজি চেয়ার আছে। ক্লান্ত হ'লে সেইটেয় ব'সে সে বিশ্রাম করে। পাশে একটা টিপয়। ধ্রুবেশ টিপয়ের উপর চা আর খাবার রাখ্‌তে বললে।

মেয়েটি সেগুলো নামিয়ে রেখে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল।

ধ্রুবেশও ইজি চেয়ারে বসে নিঃশব্দে খাবার খেতে লাগলো।

একটু পরে জিজ্ঞাসা করলে, আপনি কি আমাকে কিছু বলবেন ?

মেয়েটি যেন শক্তি সঞ্চয়ের জন্যে দরজার পাশে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো।

তারপর বললে, আমাকে আপনি বাঁচালেন কেন ?

প্রশ্নের ধরণে এবং কণ্ঠস্বরের বলিষ্ঠতায় ধ্রুবেশ চমকে উঠলো।

বিহ্বল দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে সে চেয়ে রইল। পরণে তার লাল চওড়া পাড়ের একখানা মিলের শাড়ী। সম্ভবতঃ এইখানা কিনতেই ঠাকুর বাইরে গিয়েছিল। মাথার চুল এলো ক'রে পিঠে ছড়ানো। নিরাভরণ দুটি বাহু কোলের কাছে নিবদ্ধ। চোখ যেন জ্বলছে।

বিহ্বলতার ধাক্কা কাটিয়ে ধ্রুবেশ হাসলে। বললে, শোনেননি আমি ডাক্তার। মানুষকে বাঁচানোই তো আমার পেশা।

মেয়েটি হাসলো না। বললে, তাই। নইলে মানুষ হিসাবে আমাকে বাঁচাতে চাইতেন না।

ধ্রুবেশ বিস্মিতভাবে বললে, কেন ? মানুষ কি মানুষকে বাঁচায় না ?

—সব মানুষকে নয়। অন্ততঃ আমাকে নয়। আমার বাঁচবার কোন সার্থকতা নেই।

—এ কথা বলছেন কেন ?

—বলছি এইজন্যে যে, আমার ইতিহাস আপনি কিছুই জানেন না। জানলে নিশ্চয়ই আমাকে বাঁচাতে চাইতেন না।

ধ্রুবেশ চায়ের পেয়ালাটা টিপয়ের উপর ঠক্ করে নামিয়ে রাখলে। বললে, তবুও চাইতাম।

—সমস্ত ইতিহাস জানলেও ?

বিরক্তভাবে ধ্রুবেশ বললে, আপনি বার বার ইতিহাসের কথা বলছেন কেন ? আমি এইটুকু জেনেছি যে আপনি শিক্ষিতা, ভদ্রমহিলা, আমার শ্রদ্ধার পাত্রী। এর বেশী কোনো মহিলার সম্বন্ধে আর কি জানবার থাকতে পারে ?

মেয়েটি ধ্রুবেশের মুখের উপর থেকে স্থির দৃষ্টি নামিয়ে নিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পরে বললে, আচ্ছা আমার সম্বন্ধে জানবার যেন কিছুই রইল না। ডাক্তার হিসেবে না হয় আমাকে বাঁচিয়েও তুললেন। কিন্তু এইবার আমাকে কোথায় পাঠাবেন ?

—যেখানে আপনি ইচ্ছা করবেন।

—আমার কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা নেই। কোথাও যাওয়ার জায়গাও নেই।

এবারে ধ্রুবেশ একটু থমকে গেল। বললে, কেন, যেখানে ছিলেন ?

—অবলাশ্রমে ? সেইখান থেকেই তো মরণ পণ ক'রে পালিয়ে এসেছি।

—তাহ'লে বাপের বাড়ী ? কিম্বা…

—আর কিম্বা নেই। একমাত্র বাপের বাড়ীই আছে। কিন্তু সেখানকার দরজা বন্ধ। আপনি কি জানেন না, অবলাশ্রমে কারা এসে আশ্রয় নেয় ?

এতক্ষণে ধ্রুবেশ ব্যাপারটা বুঝলে।

বললে, জানি। তাহ'লে কি করতে চান ?

—মরতে চাই।

—সে তো আছেই। তাছাড়া?

—তাছাড়া আর কি করতে পারি বলুন? কিছু লেখাপড়া করেছি। কিন্তু সে এমন কিছু নয়, যার জোরে একটা মাষ্টারীও পাওয়া যেতে পারে। আর যুবতী মেয়ের অর্থোপার্জ্জনের একমাত্র যে পথ তার চেয়ে মৃত্যু ভালো।

ধ্রুবেশ একটি সিগারেট ধরিয়ে নিঃশব্দে টানতে লাগলো।

অনেকক্ষণ পরে বললে, তাছাড়াও পথ নিশ্চয় আছে। যদি নাই থাকে, আপনি আমার এখানেই থাকতে পারেন।

—আপনার এখানে?—মেয়েটি বিস্মিতভাবে বললে,—আপনি আমাকে যাবজ্জীবন খেতে-পরতে দেবেন?

—দিলামই বা।

—কেন দেবেন?

ধ্রুবেশ এবার আবার বিরক্ত হ'ল। বললে, এমন কি কেউ দেয় না? মনে করুন, আমার খেয়াল।

মেয়েটি এবারে হেসে ফেললে। বললে, আপনার যেন খেয়াল। কিন্তু অকারণে সে অর্থ আমি নোব কি ক'রে?

ধ্রুবেশ একটু ভেবে বললে, অকারণে নিতে আপত্তি থাকে, কাজ করেই নেবেন। অনেক কাজ আপনি করতে পারেন। দেখছেন আমার খাওয়া-দাওয়া ঘর-দোরের অবস্থা। এর পেছনে খাটবার আছে। আমার কাগজপত্র যেরকম অগোছালো থাকে সেগুলো গোছাতেও আপনাকে অনেক খাটতে হবে। বিলেতে যাকে বলে house keeping, আপনি সেই কাজের ভার নিতে পারেন।

মেয়েটি কি যেন ভাবলে। বললে, তা যেন নিলাম। কিন্তু আপনার স্ত্রী কি তা পছন্দ করবেন?

স্ত্রীর প্রসঙ্গে ধ্রুবেশ হো হো ক'রে হেসে উঠলো।

বললে, যার অস্তিত্ব নেই তা নিয়ে দুর্ভাবনা করতে একমাত্র মেয়েরাই পারেন। কিন্তু আর নয়, আমার অনেক সময় আপনি নষ্ট করেছেন। এবারে দয়া করে যান।

ধ্রুবেশ উঠে দাঁড়ালো।

মেয়েটির নাম লীলা।

লীলা রইলো এবং অল্পদিনের মধ্যেই থাকার সার্থকতা প্রতিপন্ন করল। ধ্রুবেশ তার স্বাভাবিক অসামান্য অন্যমনস্কতা সত্ত্বেও বুঝলে, ঘরদোরের শ্রী ফিরেছে, কাপড়-জামা ভদ্র হয়েছে, দরকারী কাগজ-পত্র এখন আর হারায় না এবং আহার্য্যের স্বাদ বদলেছে। এমন কি তার নিজের চেহারাতেও পরিবর্ত্তন এসেছে।

এতে সে খুশি হ'ল,—নিজের জন্যেও এবং লীলার জন্যেও। এক জোড়া তীক্ষ্ণ চক্ষু সকল সময়েই তার সুখ-সুবিধার জন্যে সতর্ক হয়ে আছে, এই উপলব্ধির একটা বিশেষ আনন্দ আছে। এখন অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরতেও তার আনন্দ লাগে। ঘুমন্ত ঠাকুর-চাকরকে কড়া নেড়ে নেড়ে জাগাতে হয় না। লীলা জেগেই থাকে। দরজায় জুতোর শব্দ পেলেই হাসিমুখে দরজা খুলে দেয়।

অনুযোগ করে, অনেক রাত্রি হয়েছে।

ধ্রুবেশ বলে, মোটে একটা। কিন্তু আপনি জেগে আছেন কেন?

—নইলে আপনি খেতে দেবেন কেন ?

ঘুমন্ত ঠাকুর-চাকরের দিকে অঙ্গুলী দেখিয়ে সিঁড়িতে উঠতে উঠতে ধ্রুবেশ বলে, খেতে তো ওদেরও দিচ্ছি। ওদের তো সেজন্যে ঘুমুতে অসুবিধা হয় না।

ঘরের মধ্যে খাবার টেবিলটা মুছতে মুছতে লীলা জবাব দেয়, ওদের কথা ছেড়ে দিন। ওদের দশ দোর খোলা আছে। কিন্তু আমাকে আপনি তাড়িয়ে দিলে যাব কোথায় ?

—সে একটা কথা বটে !

লীলা একটা আশ্চর্য্য ভঙ্গীতে ওর দিকে কটাক্ষ হেনে বলে, এইবার পোষাক ছাড়ুন। আপনার খাবার আনছি। দুটো খেতে দিচ্ছেন বলে আর বেশী কষ্ট দেবেন না।

পোনেরো মিনিটের মধ্যে লীলা খাবার নিয়ে আসে।

—এখনো গরম আছে দেখছি।

লীলা লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নেয়।

—এও বোধ হয় দুটো খাওয়া পরার বিনিময়ে ?

—আবার কি ?

ধ্রুবেশ বলে, হুঁ।

সপ্তাহ দুয়েক পরে ধ্রুবেশ পোষাক পরে কলেজে বেরুবে এমন সময় চাকরটা এসে একটা চিরকুট দিলে।

—কি এটা ?

চাকরটা বললে, দিদিমণি দিলেন।

পড়ে ধ্রুবেশ দেখে একটা ফর্দ্দ। দরজা জানালায় তার পর্দ্দার বালাই কোনোকালেই নেই। তারই জন্যে কয়েক গজ কাপড় প্রয়োজন।

ধ্রুবেশ বিহ্বলচিত্তে বললে, সর্ব্বনাশ কাণ্ড! কোথায় তোর দিদিমণি?

লীলা এসে বললে, কি বলছেন?

ধ্রুবেশ হাতের ফর্দ্দটা তুলে বললে, এ সব কোথায় পাওয়া যায়?

—সে আমি কি জানি? কোথাও পাওয়া যায় নিশ্চয়ই। নইলে···

—নইলে লোকেরা জানলায় পর্দ্দা লাগায় কি করে? আচ্ছা, সে না হয় আমি জেনে নোব। কিন্তু বিকেলের দিকে আপনার কি অবসর আছে?

—আছে বললে কি মাইনে কেটে নেবেন?

ধ্রুবেশ বললে, নেওয়াই নিয়ম। কিন্তু এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হবে। শুনুন্, আজ বিকেলের দিকে আমি বরং একটু সকাল সকাল ফিরব। আপনি তৈরী থাকবেন। দুজনে গিয়ে কিনে আনা যাবে। আমার এ সম্বন্ধে কোনো পছন্দই নেই।

—বেশ।

এই প্রথম ধ্রুবেশ ওকে নিয়ে বেড়াতে বেরুলো।

এর দিন কয়েক পরে, রাত্রি তখন অনেক, বাইরে ঝিপঝিপ বৃষ্টি হচ্ছিল। ধ্রুবেশ খাটে শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিল।

দরজার বাইরে থেকে লীলার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, আসতে পারি?

—নিশ্চয় পারেন।—ধ্রুবেশ ধড়মড় করে উঠে বসলো।—ওটা কি? কফি? বাঃ!

কফির পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে লীলা বললে, ঝিপঝিপ বৃষ্টি পড়ছে। ঘুম এল না। বাইরে এসে দেখি, আপনার ঘরে আলো জ্বলছে।

ভাবলাম, এ সময়ে এক পেয়ালা কফি খাওয়াতে পারলে আপনি নিশ্চয় খুশি হবেন।

ধ্রুবেশ হেসে বললে, খুব খুশি হয়েছি। সত্যি কথা বলতে কি, খোলা বই সামনে নিয়ে কি যেন ভাবছিলাম। কি যে ভাবছিলাম, সে আমিও জানি না। এখন বুঝছি, এই কফির কথাই ভাবছিলাম। কিন্তু আপনি ঘুমোননি যে?

—বৃষ্টির রাত্রে কিছুতেই আমার ঘুম আসে না।

—আশ্চর্য্য তো!

—আশ্চর্য্যই বটে। এমনি এক বৃষ্টির রাত্রে একজনের হাত ধরে ঘর থেকে বাইরে এসেছিলাম। আবার এমনি একটা বৃষ্টির রাত্রে আর একজনের সঙ্গে একদিন বাইরে থেকে ঘরে এলাম। বোধ করি, সেই জন্যেই এমন হয়।

ব'লে অন্য দিকে চেয়ে এমন এক রকম ক'রে লীলা হাসলে যে, কেমন একটা অস্বস্তিতে ধ্রুবেশের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল।

গম্ভীরভাবে বললে, ও সব কথা মনে ক'রে লাভ নেই। রাত্রি অনেক হয়েছে। শুতে যান।

—হ্যাঁ যাই।

ব'লে লীলা শ্রান্তভাবে উঠে দাঁড়ালো। ধ্রুবেশের মনে হ'ল, একটা মস্ত বড় দীর্ঘশ্বাস প্রবল চেষ্টায় চেপে সে যেন চ'লে গেল।

দরজা বন্ধ ক'রে আলো নিভিয়ে দিয়ে ধ্রুবেশ শুয়ে পড়লো।

শীত শেষ হয়ে বসন্ত এল এবং তার পরে গ্রীষ্মকাল। গরম বেশি পড়েনি। সবে গরমের আমেজ দিয়েছে।

সন্ধ্যার পরে ওদের বিলেত-ফেরৎ ডাক্তারদের একটা ডিনার পার্টি

ছিল। ধ্রুবেশ বলেই গিয়েছিল, তার ফিরতে রাত হবে। সুতরাং চিন্তার কারণ ছিল না। পার্টি থেকে ও গেল ওর একটি বন্ধুর বাড়ী। সেখান থেকে যখন ফিরলো তখন রাত্রি একটা।

চাকরটা বোধ করি লীলার বিশেষ হুকুমে দরজার কাছেই শুয়ে ছিল। কড়া নাড়তেই দরজা খুলে দিলে।

—তোদের সব খাওয়া হয়েছে ?

—হ্যাঁ বাবু।

ধ্রুবেশ শিষ দিতে দিতে উপরে চলে এল। তার শোবার ঘরের জানালা দিয়ে আলো জ্বলছে দেখে তার ধারণা হ'ল, লীলা এখনও জেগেই আছে। কিন্তু দরজা খুলেই সে দাঁড়িয়ে পড়লো।

লীলা তারই শোবার ঘরে আছে বটে, কিন্তু জেগে নয়, ঘুমিয়ে এবং তারই বিছানায়। মাথার উপর পাখাটা অল্প অল্প ঘুরছে। তারই হাওয়ায় ওর শাড়ী চঞ্চল হয়ে উঠেছে। শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ওর তনুদেহ আন্দোলিত হচ্ছে। ঘরের ভিতরকার ব্ল্যাক-আউটের অবগুণ্ঠিত আলো ওর ঈষদুন্মুক্ত বুকে এ বিচিত্র রঙের শাড়ীর উপর এসে পড়েছে।

ধ্রুবেশ আর দাঁড়িয়ে থাকতে সাহস করলে না। অত্যন্ত সন্তর্পণে দরজা বন্ধ করে ল্যাবরেটরী ঘরে ফিরে এল। কেমন যেন ওর ভয় হ'ল। লীলার চোখের দিকে চাইলে এখন মাঝে মাঝেই ওর ভয় হয়। লীলার চোখে কিসের যেন ক্ষুধা।

তবু এর আগে আর কোনো দিন লীলা তার বিছানায় এসে শোয়নি।

ধ্রুবেশ ল্যাবরেটরী ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে ইজিচেয়ারে ফিরে এল এবং এক সময় ঘুমিয়ে গেল।

পরদিন সকালে লীলা যখন চা নিয়ে এল, ধ্রুবেশ তখন ওর মুখের দিকে চাইতে পারছে না।

নতমুখে লীলা বললে, কাল ভারি লজ্জা দিয়েছেন।

—কেন ?

লীলা সে প্রশ্নের আর উত্তর দিলে না। বললে, সত্যি কথাই বলি, আপনার বিছানাটা দেখে ভারী লোভ হ'ল। ইচ্ছা হ'ল একটু শুই। ভেবেছিলাম, আপনার সাড়া পেলেই উঠে পড়ব। কিন্তু চুরি ধরা পড়ে গেল। এমনই ঘুমিয়ে পড়্লাম যে, কখন আপনি এলেন, কখনই বা চলে গেলেন, টেরই পেলাম না।

জড়িতকণ্ঠে ধ্রুবেশ বললে, আপনি ঘুমুচ্ছেন দেখে আর জাগালাম না।

—এখানে শুতে আপনার খুব কষ্ট হয়েছে।

ধ্রুবেশ তাড়াতাড়ি বললে, কিছুমাত্র না। এ আমার খুব অভ্যাস আছে। কাজ করতে করতে কত রাত্রি যে এখানেই ঘুমিয়েছি তার ইয়ত্তা নেই।

লীলা বললে, ওটা বাজে কথা। আসলে কেন যে আমাকে আপনি জাগাননি সে আমি জানি।

—কি জানেন ?

—জাগাতে গেলে পাছে আমার গায়ে হাত দিতে হয় বলেই জাগাননি।

—কক্ষণো না।

নয় ?—লীলা কৌতুকভরে ওর দিকে চাইলে এবং অনাবৃত একখানি হাত ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে,—আচ্ছা, আমার গায়ে হাত দিন তো দেখি।

ধ্রুবেশ রীতিমতো দমে গেল। ওর গলায় টোষ্টের একটা টুকরো কিম্বা কি যেন আটকে গেছে।

অস্পষ্ট স্বরে বললে, সে আর এমন কি?

—কিছুই নয়। কিন্তু সেও আপনি পারেন না।

ধ্রুবেশ কোথায় যেন খোঁচা খেলে।

বললে, পারি না?

—না। দিন তো দেখি?

ধ্রুবেশ টপ্ ক'রে আঙ্গুলের প্রান্ত দিয়ে ওর বাহুর একস্থান স্পর্শ ক'রে বললে, এই তো দিলাম।

কিন্তু সে-হাত আর সরিয়ে নিতে পারলে না। লীলা খিল খিল ক'রে হেসে ওর হাত নিজের দুই মুঠোর মধ্যে শক্ত ক'রে চেপে ধ'রে বললে, এইবার! এ হাত যদি না ছাড়ি, কি করবেন?

ধ্রুবেশের সমস্ত শরীর তখন অবশ হয়ে এসেছে।

শুধু বললে, বাঃ!

লীলার চোখে ধীরে ধীরে একটা হতাশ বিষণ্ণ দৃষ্টি ফুটে উঠলো। আস্তে আস্তে ওর হাতটা ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

দুপুরে কলেজ থেকে খুব ভয়ে ভয়েই ধ্রুবেশ ফিরে এল।

খাবার সময় লীলা তার সামনে এল না। তাতে সে আরও ভয় পেয়ে গেল।

চুপি চুপি চাকরকে জিজ্ঞাসা করলে, তোদের দিদিমণি কোথায় রে?

—তিনি তো চলে গেছেন বাবু?

মুখের ভাত ধ্রুবেশের গলায় আটকে গেল।

—সে কি?

—তাই তো গেলেন বাবু। জিগ্যেস করলাম, কেন যাচ্ছেন দিদিমণি? বললেন, যেতে তো একদিন হ'তই সুবল। পরের বাড়ীতে তো বেশিদিন থাকা যায় না। তার চেয়ে এখন যাওয়াই ভালো।

ধ্রুবেশ নিঃশব্দে চেয়ে রইল।

চাকরটা বলতে লাগলো:

—কিছুই নিয়ে যাননি বাবু। এক বস্ত্রে গেছেন। কেবল আলমারী খুলে দশটা টাকা নিয়ে আঁচলের খুটে বাঁধলেন। হাসতে হাসতে বললেন, দশটি টাকা নিযে গেলাম। তোমার বাবুকে বোলো সুবল, এ বোধ হয় আর শোধ করার সুযোগ হবে না।

চোখের জল গোপন করার জন্যে সুবল দ্বারের অন্তরালে মুখ সরিয়ে নিলে। বললে:

—বলে গেলেন, তুমি তো বাবুর পুরাণো চাকর সুবল, বাবুকে তুমি ভালোবাসো। তোমাকেই বলে গেলাম, আমি নেই বলে বাবুর খাওয়ার যেন অযত্ন না হয়।

ধ্রুবেশ হঠাৎ জিগ্যেস করলে, কোথায় গেছেন জানিস?

—কিছুতেই বললেন না বাবু।

ধ্রুবেশের খাওয়া হ'ল না। মুখ-হাত ধুয়ে বিছানায় বসে একটা সিগারেট ধরালে। বিছানায় শুলো, কিন্তু চোখে ঘুম এল না। একটি মেয়ে নিরাপদ নিশ্চিন্ত আশ্রয়, সসম্মান জীবনযাত্রা ছেড়ে একাকিনী কোথায় বেরিয়ে গেল, কেনই বা চ'লে গেল। এই প্রশ্ন যতই ভাবে কিছুতেই এর আর কিনারা করতে পারে না।

ক্ষণিকা

আকাশ সকাল থেকেই মেঘাচ্ছন্ন।

রবিবারের সকাল। কাজের কোনো তাড়া ছিল না। বাইরের সঞ্চরণশীল জনতার দিকে চেয়ে নিঃশব্দে বসে ছিলাম। কিছুই ভালো লাগছিল না।

এমন সময় মেঘের ফাঁক থেকে বিদ্যুতের মতন সেই জনতার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল নবেন্দু। পথ থেকে একেবারে আমার ঘরের মধ্যে।

নবেন্দু মোটা মাইনের সরকারী কর্মচারী। আয়েসী লোক। এমন একটা মেঘাচ্ছন্ন সকালে সে যে কোনো কারণেই বেরুতে পারে, ভাবতেও পারিনি। তাকে দেখে আমি যুগপৎ বিস্মিত এবং পুলকিত হয়ে চীৎকার করে উঠলাম!

—কি ব্যাপার! নবেন্দু? তুমি? এই বাদলার দিনে? বসো, বসো।

হাতের ছাতাটা বন্ধ করে নবেন্দু সন্তর্পণে ঘরের একটা কোণে রাখলে। তারপর পাশের চেয়ারে বসে হাসলে।

বললে, মেয়েটার জন্যে ক'টা টুকিটাকি জিনিস কেনবার ছিল। তাই এদিকে এসেছিলাম। ভাবলাম, অনেক দিন তোমার সঙ্গে দেখা নেই, এতদূর এলাম যদি, একবার দেখাটা করে যাই।

—বেশ করেছ। একটু চা খাবে? ওরে…

চায়ের কথা বলে দিলাম।

নবেন্দু বললে, তাছাড়া তোমার সঙ্গে দেখা করবার বিশেষ দরকারও ছিল।

সে মিটিমিটি হাসতে লাগলো।

বললাম, বলে ফেল।

বললে, তোমার "পান্থনিবাস" বলে একখানা বই আছে না?

—আছে বোধ হয়। তারপরে?

—বইখানা পড়লাম।

—বল কি হে! এ যে আমার কাছে একটা দস্তুরমত সংবাদ! তুমি নিজে পড়লে?

—ঠাট্টা করছ?

—ঠাট্টা নয়। বাঙালী কলেজ থেকে বেরিয়ে বই বড় একটা ছোঁয় না। যারা ছোঁয়, তারা ইংরাজি বই-ই ছোঁয়। এ অবস্থায় কেউ একখানা বাঙলা বই পড়েছে শুনলে চমকে উঠতে হয়। কিনে পড়লে?

নবেন্দু বললে, না, কিনে নয়। গৃহিণী পাড়ার লাইব্রেরির মেম্বার। সেদিন দুপুরে ঘুম আসছিল না। হাতের কাছে বইখানা পেলাম। দেখলাম, তোমার লেখা। পড়তে বসলাম। কিন্তু তুমি একটা অন্যায় করেছ।

অবিচলিতভাবে বললাম, সে আর আমার পক্ষে এমন একটা অসম্ভব কি?

উত্তরের ভঙ্গিতে নবেন্দু হেসে ফেললে।

বললে, আমাকেই নিয়ে বই লিখেছ। সুতরাং আমাকে এক কপি উপহার দেওয়া তোমার উচিত ছিল। যাক্‌গে। যা বলতে এসেছি শোন।

নবেন্দু বলে কি! ওকে নিয়ে বই লিখেছি? ওর সঙ্গে তখন আমার পরিচয়ই ছিল না বোধ হয়। কিন্তু বইখানার প্লট আমার নিজেরই ভালো মনে আসছিল না।

নিরীহভাবে বললাম, বল।

—তপনের সঙ্গে শ্যামলীর ফের দেখা হয়েছে।

নবেন্দু আবার আগের মতো মিটিমিটি হাসতে লাগলো।

গল্পের প্লটটা মনে করবার চেষ্টা করতে করতে বললাম, বল কি হে! কোথায়?

—দেওঘরে। দিন পনেরো আগে।

—Good. এ যে চমৎকার একটা গল্পের প্লট। তারপর? সে যে অনেক দিনের কথা। চিনতে পারলে?

—আমি পারিনি। পারা সম্ভবও নয়। ওর সেই ছিপছিপে চেহারা আর নেই। বেশ স্থূল হয়েছে। অনেকগুলি ছেলেমেয়ে দেখলাম। মুখের সেই ছেলেমানুষী ভাবও আর নেই। কেমন একটা গাম্ভীর্য এসেছে। চোখের দৃষ্টিতেও আর সেই চঞ্চলতা নেই। তাতেও একটা প্রশান্তি এসেছে।

নবেন্দু আবার হাসলে।

বললে, তাতো আসবেই। অনেক দিন হয়ে গেল যে। সেও ছেলেমানুষ থাকতে পারে না, আমিও না। কিন্তু ও আমাকে ঠিক চিনেছিল। পথে দেখা। পাশ কাটিয়ে চলে আসছিলাম। জিগ্যেস্ করলে, মাষ্টারমশাই না? চমকে উঠলাম। কোনোকালে যে মাষ্টারি করেছি, তাও আর মনে পড়ে না। কিন্তু তখনই চিনতে পারলাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, তারপরে?

নবেন্দু বললে, বলছি। কিন্তু তোমার চা কোথায়?

চা? চায়ের কথা শ্যামলীর শেষটুকু শোনবার আগ্রহে ভুলেই গিয়েছিলাম।

তাড়াতাড়ি বললাম, দাঁড়াও দেখি।

চা এল। সঙ্গে আরও কিছু কিছু অনুপান। বোঝা গেল, এই জন্যেই চা দিতে দেরি হচ্ছিল।

সেগুলো ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে রুদ্ধনিশ্বাসে প্রশ্ন করলাম, তারপরে?

নবেন্দু বলতে লাগলো:

সেখান থেকে আমাকে ও ওর বাড়িতে টেনে নিয়ে গেল। মস্ত বড় বাড়ি। অনেক চাকর-বাকর। সুন্দর স্বাস্থ্যবান ছেলেমেয়ে। ঘরের মধ্যে মূল্যবান আসবাবপত্র। ওর নিজেরও গায়ে এক-গা গহনা। দেখলাম, বেশ আছে। বড় মেয়েটির বিয়ে দিয়েছে কোথাকার এক রায়-বাহাদুরের ছেলের সঙ্গে। বড় ছেলে স্কুলে পড়ছে। আর কি চাও?

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে নবেন্দু আমার দিকে চেয়ে হাসলে।

আমি নিঃশব্দে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইলাম।

নবেন্দু আবার বলতে লাগলো:

মহামুস্কিলে পড়েছে। স্বামী কলকাতার অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁর কলকাতা ছেড়ে যাওয়ার উপায় নেই। ডাকের গোলমালে চিঠিপত্রও নিয়মিত পাচ্ছে না, টেলিগ্রামও নাকি সময়ে পৌছুচ্চে না।

বললে, কি করি বলুন তো মাষ্টারমশাই? সেই ডিসেম্বরে এসেছি। এখানকার এই দুরন্ত গরমও কাটিয়েছি। কিন্তু এখন চিঠিপত্র না

পাওয়ার ফলে যেন আরও অসহ্য হয়ে উঠেছে। কেমন আছে সব, তাই বা কে জানে?

আমার সামনে স্বামীর সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করেই ও যেন হঠাৎ লজ্জিত হয়ে পড়লো।

বললাম, ভাবছ কেন? ভালোই আছেন। দেখছ তো চারদিকের অবস্থা।

—সেই তো মুস্কিল হয়েছে। মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে, সবশুদ্ধ কলকাতা পালাই। কিন্তু ঠিক এই সময়েই রেল বন্ধ হল।

—সেই ত আরও মুস্কিল।

—এমন করে আরও কতদিন থাকতে হবে বলতে পারেন?

হেসে বললাম, জানি না।

বললে, টাকাপয়সা হু হু করে উড়ে যাচ্ছে। সে যাকগে। কিন্তু এই দেখুন, ছেলেটার পড়া একেবারে বন্ধ। দিনরাত্তির বাগানে প্রজাপতির পিছনে ছুটোছুটি করছে।

—এখানে কি টিউটর পাওয়া যাচ্ছে না?

—তা যাবে না কেন? একটা রেখেছিও ত্রিশ টাকা মাইনে দিয়ে। কিন্তু যাই বলুন না কেন, আমি তো দেখছি স্কুল না থাকলে ছেলেদের পড়া হয় না।

—সে ঠিক।

—মাষ্টার সকালে-সন্ধ্যায় আসেন, পড়িয়ে যান। আর সমস্ত দুপুর ওরা বাগানময় দাপাদাপি ক'রে বেড়ায়।

—এর উপর আবার উনি ঠিক করেছিলেন, বড় মেয়েটিকেও এখানে আনতে। ভাগ্যিস্ সে আসেনি। আমি কোনো রকমে আছি, কিন্তু সে কেঁদে-কেটে অনর্থ করত।

এ বিষয়ে আমার কিছু বলবার ছিল না। চুপ করে রইলাম।

ও জিজ্ঞাসা করলে, বাবা মারা গেছেন শুনেছেন বোধ হয় ?

—নিশ্চয়। হঠাৎ মারা গেলেন, না ?

—হঠাৎ ঠিক নয়। ভুগছিলেনই। তবে এত শিগ্‌গির যাবেন, তা কেউ ভাবিনি। ছোট ভাইটি বিলেতে। আমি কলকাতায়। মা একা বাবাকে নিয়ে মধুপুরে। টেলিগ্রাম পেয়ে আমরা যেদিন গেলাম তার পরের দিনই মারা গেলেন।

শ্যামলী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে। আমিও নিঃশব্দে বসে রইলাম। মিথ্যে সান্ত্বনার কথা কি বলব ?

তখনই ও ভিতরে চলে গেল এবং একটু পরে চা নিয়ে উপস্থিত হল।

তখন সবে সন্ধ্যা।

শ্যামলী হাসতে হাসতে বললে, আপনি কিন্তু আমাকে চিনতে পারেননি।

লজ্জিতভাবে বললাম, না।

—খুব মোটা হয়ে গেছি ?

—খুব না। তবু···

—তবু হয়েছি অনেকটা। সে তুলনায় আপনার পরিবর্তন ঢের কম। আমি দেখেই চিনেছিলাম।

—চিনতে আমিও পারতাম। আসল কথা···

বাধা দিয়ে ও বললে, যাকৃগে। আসল কথাই জিগ্যেস্ করা হয়নি। কোথায় উঠেছেন ?

এতক্ষণ পরে আমার একটা হাসবার উপলক্ষ হ’ল।

বললাম, সে একটা হাসির কথা। এখানে আমারও একটা ছোট্ট

বাড়ি আছে। ডিসেম্বরে আমিও মেয়েছেলে পাঠালাম। তারপরে আজ শীত, কাল গরম, পরশু বৃষ্টি—এমনি করেই চলছিল। ইতিমধ্যে ট্রেণ বন্ধ হয়ে গেল। চিঠি লিখি, জবাব পাই না। টেলিগ্রাম করি, তারও সেই অবস্থা। অবশেষে ক'দিনের ছুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। তারপরে কেমন করে এলাম জানো?

আমার কথা ও যে ভালো করে শুনছিল, তা মনে হল না।

অন্যমনস্কভাবে মাথা নেড়ে বললে, না।

—খানিকটা রেলে, খানিকটা মোটর বাসে, বাকিটা হেঁটে!

নিজের রোমাঞ্চকর অভিযানে গর্বিতভাবে হাসলাম।

ও বললে, খুব কষ্ট হয়েছে তো তাহলে?

বললাম, তাই কি কষ্টের শেষ হয়েছে? এসে দেখি বাড়ি খালি। মালী বললে, এক বাবু এসে মা-জীদের ডুমকা নিয়ে গেছেন। সেখানে আমার শালা থাকে। বুঝলাম, ব্যাপার দেখে সেই এসে নিয়ে গিয়েছে।

শ্যামলী ব্যস্তভাবে উঠে পড়লো।

বললে, সে কি! তাহলে এখানেই আপনি খাবেন। বেশ লোক তো আপনি!

আমি বাধা দিয়ে বললাম, না, না। কিচ্ছু দরকার হবে না। শোন, বলছি···

ও কিন্তু ফিরেও চাইলো না। ভিতরে চলে গেল।

একটু পরে ফিরে এসে বললে, আপনার বাসাটা কোথায় বলুন? মালী গিয়ে খবর দিয়ে আসবে, বাসায় আপনি আর ফিরবেন না।

ব্যস্তভাবে বললাম, সে কি! কাল সকালেই আমাকে দুমকা যেতে হবে যে!

—বেশ তো, সকালেই যাবেন।

শ্যামলী একজেদী ছোটবেলা থেকেই।

গল্প ক্রমেই জমে আসছে।

বললাম, আর এক পেয়ালা চা হোক্ নবেন্দু?

নবেন্দু বললে, আপত্তি নেই। কিন্তু এবারে যেন আর অনুপান না থাকে।

আমি উঠছিলাম। কিন্তু পর্দার অন্তরালে চুড়ির শব্দে বুঝলাম, তার প্রয়োজন নেই।

সিগারেটের টিনটা এগিয়ে দিয়ে বললাম, তার পরে বল।

নবেন্দু বলতে লাগলো :

খাওয়ার সময় শ্যামলী কাছে বসে যখন খাওয়াতে লাগলো, তখন বেশ লাগছিল।

খাওয়া-দাওয়ার পরে শোবার ঘরে খাটে এসে বসে সিগারেট খাচ্ছি, একটু পরে পান মুখে নিয়ে শ্যামলী এল।

খাটের থেকে দূরে একটা নীচু টুলে বসে বললে, আপনার সঙ্গে আর কখনও যে দেখা হবে স্বপ্নেও ভাবিনি। খুব আশ্চর্যভাবে দেখা হয়ে গেল, না?

—সত্যি। তোমার কথা আমি কিন্তু অনেক সময় ভেবেছি।

শ্যামলী হেসে ফেললে।

বললে, মিথ্যে কথা রাখুন। ছেলেপুলে কি ?

—ছুটি ছেলে, ছুটি মেয়ে।

—মেয়েটি বড় ?

—না ছেলেটি।

—পড়ছে ?

—হাঁ।

—বড় মেয়ের এখনও বিয়ের বয়স হয়নি ?

—না।

—তুমকাতেই কি আপনার শ্বশুরবাড়ি ?

—না, শালা সেখানে চাকরী করেন।

শ্যামলী এ প্রসঙ্গে আর কিছু জিজ্ঞাসা করলে না।

আমি হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, আমাদের বিয়ে হবে না শুনে, কী কান্না তুমি কেঁদেছিলে মনে আছে ?

—আর আপনি ?

—আমিও কেঁদেছিলাম।

ও অন্তদিকে চেয়ে কি যেন মনে করে হাসলে।

বললে, এখন মনে হয় ছেলেমানুষী, না ?

—হ্যাঁ।—আমিও হাসলাম।

আমার সামনের টিপয়ে ডিবে-ভর্তি পান এবং এক কৌটো জর্দা।

বললে, আপনি পান খাচ্ছেন না যে ?

—পান তো আমি বেশি খাই না।

—জর্দা ?

—একেবারেই না।

—কিন্তু আগে খুব খেতেন মনে হচ্ছে যেন।

—তোমার ভুল হচ্ছে।

কি যেন চিন্তা করে শ্যামলী বললে, তা হবে। আপনার আগে আর একটি বুড়ো মাষ্টার ছিলেন, তিনিই খেতেন বোধ হয়। যেদিন পড়ায় ফাঁকি দেওয়ার ইচ্ছে হ'ত, তাঁকে প্রচুর পান জর্দা ঘুস দিয়ে নিস্কৃতি পেতাম।

শ্যামলী হাসতে লাগলো।

বললে, ঠিক। আপনি নয়, সেই বুড়ো মাস্টার। অথচ আপনি খেতেন ভেবে এক কৌটো জর্দা আনালাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, বৌদিকে তোমার মনে পড়ে?

—বাঃ, তাঁকে মনে পড়বে না? কেমন আছেন তিনি?

—বছরখানেক হ'ল মারা গেছেন।

—মারা গেছেন! আহা! কি হয়েছিল? ছেলেপুলে কি?

—টাইফয়েড হয়েছিল। ছেলেপুলে অনেকগুলি। বোধ করি, আট-ন'টি।

—আহা!

শ্যামলী নিঃশব্দে বোধ করি বৌদির কথাই ভাবতে লাগলো।

হঠাৎ বললে, আপনার দাদা কি আর বিয়ে করেছেন?

উত্তর দিতে লজ্জা পেলাম। মাথা নীচু ক'রে বললাম, মাস ছয় হ'ল করেছেন।

কিন্তু ও যেন তাতে কিছুমাত্র বিস্মিত বা বিরক্ত হ'ল না।

বললে, বেশ করেছেন। নইলে অতগুলি কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে বিব্রত হতেন।

তারপরেই বললে, ডুমকা থেকে আপনি ক'লকাতা ফিরবেন তো ?

—ফিরতেই হবে। চাকরী।

বললে, আচ্ছা, ঠিকানা দিলে ওঁর সঙ্গে দেখা করার আপনার সুবিধা হবে ?

—কেন হবে না ?

—আর কিছু নয়, ওঁর আবার সায়টিকা আছে। যখন যন্ত্রণা আরম্ভ হয়, পাঁচ-সাতদিন অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকেন। কেউ তো নেই সেখানে। ঠাকুর আর চাকর। চোদ্দ দিন চিঠি পাইনি। ভাবছি, কেমন যে আছেন।

ও করুণনেত্রে আমার দিকে চেয়ে রইল।

বললাম, আমি গিয়েই দেখা করব। তুমি কিছু ভয় পেও না। ডাকের গোলমালেই বোধ হয়···

—আমারও তাই মনে হয়।

হঠাৎ পাশের ঘরে যেন একটা অব্যক্ত গোঙানির শব্দ উঠলো। আমি চমকে উঠেছিলাম।

শ্যামলী হেসে বললে, ও কিছু নয়। খোকাটা সারাদিন পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে দুষ্টুমি করে। আর রাত্রে তাই স্বপ্ন দেখে চ্যাঁচায়। কিন্তু রাত হয়েছে, এবার আপনি ঘুমোন।

ও চলে যাচ্ছিল।

হঠাৎ ডাকলাম, শ্যামলী

আমার কণ্ঠস্বরে ও যেন একবার চমকে উঠলো। কিন্তু তখনই শান্তস্বরে বললে, না, আর শ্যামলী নয়। এবার ঘুমোন। রাত অনেক হয়েছে।

ঘড়িতে দেখি, রাত তখন দুটো। চারিদিক নিস্তব্ধ। শ্যামলীর ঘরের দরজা বন্ধ করার শব্দ পাওয়া গেল। ধমক-খাওয়া শিশুর মতো আমিও শুয়ে পড়লাম।

এই পর্য্যন্ত ব'লে নবেন্দু চুপ করল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এই শেষ? আর কিছু নেই?

নবেন্দু বললে:

পরের দিন সকালে যখন বেরুচ্ছি, আমার হাতে একখানা বই দিয়ে বললে, এটা নিয়ে যান।

দেখি রবীন্দ্রনাথের "ক্ষণিকা"। কুড়ি বছর আগে ওর জন্মদিনে খুব গোপনে উপহার দিয়েছিলাম।

ব্যথিত কণ্ঠে বললাম, ফিরিয়ে দিলে?

হেসে বললে, যাকে দেওয়া হয়েছিল সে কবে ফুরিয়ে গেছে। আমার কাছে পড়ে থেকে কি হ'ত?

বললাম, কিন্তু যে দিয়েছিল তাকেই বা খুঁজে পাচ্ছি কোথায়?

একটু ভেবে বললে, সে ঠিক।

বইখানা তার বড় ছেলেটিকে দিয়ে চলে এলাম।

নবেন্দু একটা সিগারেট ধরালে।

খানিক পরে বললে, আচ্ছা, তুমি তো বই-টই লেখ। বলতে পারো মানুষকে ভালোবাসার কোনো অর্থ হয়?

আমি চুপ ক'রে রইলাম।

নবেন্দু বললে, মনে.কর নদী। সে তো জল ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু সেই জল অহর্নিশি বয়ে চলেছে। তার ধারা বদলাচ্ছে। তেমনি তো মানুষ। প্রত্যেকটি মুহূর্ত তার এক একটি জীবন। ধর শ্যামলী। সেদিন তাকে চিনতেই পারলাম না। তাহ'লে কুড়ি বছর আগে সেদিন একান্ত করে যাকে ভালোবেসেছিলাম, সে কে? কোথায়ই বা গেল?

নবেন্দু আবার বললে, তাহ'লে কি বলবো ভালবাসা জীবধর্মের উপাদান ছাড়া আর কিছুই নয়? নইলে সেদিন রাত্রে অমন করে ওকে ডেকেছিলাম কেন?

এ কথারও উত্তর আমার জানা নেই। আমি চুপ করেই রইলাম।

নহবৎ

জেল-গেট থেকে সুপ্রকাশ যখন বেরিয়ে এল, তখন বেলা ত্নটো। পরণে তার খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবী, মাথায় গান্ধীটুপি।

ছ'মাস পরে সুপ্রকাশ বাইরের মুক্তির মধ্যে এসে দাঁড়ালো। গভীর বিস্ময়ে একবার সে উর্দ্ধাকাশের দিকে, একবার সম্মুখের চলমান ট্রাম-বাসগুলির দিকে চাইলে।

দিনটা শারদীয়া পঞ্চমী।

আকাশের গায়ে লঘু শাদা মেঘের মন্থরতায় যেন ছুটির বার্ত্তা লেখা আছে। জনতার চঞ্চলতায় সেই আনন্দ যেন ঝিলমিলিয়ে উঠেছে। চারিদিকে যেন কাজ শেষ করার অপরিসীম তাড়া পড়ে গেছে।

সুপ্রকাশ যেন কার প্রত্যাশায় একটু বিলম্ব করলে। কর্ম্মব্যস্ত অপরিচিত জনতার মধ্যে কাকে যেন খুঁজলে।

কিন্তু মিথ্যে খোঁজা।

সে যে আজকে ছাড়া পাবে অসীমার তা জানার কথা নয়। বস্তুতঃ সকাল ন'টা পর্য্যন্ত সে নিজেই জানতো না, সে আজকে ছাড়া পাবে। হিসাব মতো তার ছাড়া পাওয়ার কথা লক্ষ্মীপূজার দিন। এ মুক্তি নিতান্তই অপ্রত্যাশিত।

সুপ্রকাশ তার জিনিসপত্র নিয়ে একটা ট্যাক্সিতে উঠে বসলো। এবং একটু পরেই একটা হোটেলে এসে উপস্থিত হ'ল।

কে জানে, অসীমা এখনও ক'লকাতায় আছে কি না। ওদের কলেজের ছুটি বোধ হয় আগেই হয়ে গেছে।

সুপ্রকাশ হাত-মুখ ধোওয়ার আগে তাকে টেলিফোন করতে গেল:

হ্যালো, অসীমা আছে? আমি সুপ্রকাশ।

হ্যাল্লো! সুপ্রকাশদা? কি আশ্চর্য্য! কখন ছাড়া পেলে তুমি?

আধঘণ্টা আগে। শোন। আমি ভেবেছিলাম, তুমি চলে গেছ।

চলেই যেতাম সুপ্রকাশদা। এখন দেখছি, একসঙ্গে যাব' বলেই বোধ হয় আটকে গেছি। এক মিনিট দাঁড়াও।

সুপ্রকাশ দাঁড়িয়ে রইল। মনে হ'ল, অসীমা যেন কার সঙ্গে কথা বলতে গেল। একটু পরেই আবার তার কণ্ঠস্বর শোনা গেল:

হ্যালো, সুপ্রকাশদা, শোন।

বল।

মামীমা বলছেন, তুমি আজকে এইখানেই খাবে। এখান থেকে আজকে সন্ধ্যের গাড়ীতে আমরা দুজনেই বাড়ী যাব। তুমি কোথায় উঠেছ?

হোটেলে।

তাহ'লে জিনিসপত্র নিয়ে তুমি এখনই চলে আসছ তো? সময় বেশি নেই কিন্তু।

সুপ্রকাশ হাত-ঘড়িটা দেখলে। সময় বেশি নেই সত্যি।

বললে, কিন্তু জিনিসপত্র নিয়ে?

আচ্ছা, থাক তাহ'লে। তুমিই এস। ষ্টেশনে যাওয়ার পথে ওগুলো নিলেই চলবে। দেরী কোরো না। বুঝলে?

যে আজ্ঞে।

সুপ্রকাশ রিসিভারটা নামিয়ে রেখে শিস্ দিতে দিতে বেরিয়ে এল। দেরী হবার বিশেষ কারণ নেই। জিনিসপত্র সামান্যই। যা আছে তারও বাঁধন খোলা হয়নি। কেবল দাড়িটা কামাতে হবে। আর বেশ ক'রে সাবান মেখে স্নানটা করতে হবে। ছ'মাসের কারাজীবনে যে ক্লেদ তার দেহে-মনে সঞ্চিত হ'য়েছে, তা ধুয়ে ফেলা দরকার।

অসীমা থাকে মামার বাড়ীতে, এবং সেই বাড়ীটা সুপ্রকাশের অপরিচিত নয়। পরন্তু বহু সন্ধ্যা সেখানে তার কেটেছে। কতদিন সেখানে খাওয়া-দাওয়া ক'রেছে। অসীমার মামা এবং মামীমা তাকে বিশেষ স্নেহ করেন।

সুপ্রকাশ এবং অসীমা জানে না, কিন্তু স্নেহ নিতান্ত অকারণ নয়।

অসীমার চেয়ে এক বছরের বড় একটি মামাতো দিদি আছে। অল্পদিন হ'ল মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে। কিন্তু তার আগে অসীমার মামা এবং মামী উভয়েরই দৃষ্টি সুপ্রকাশের উপর পড়েছিল। সুপ্রকাশ তখন সবে ক'লকাতার একটি কলেজে প্রোফেসরী পেয়েছে। সেই সময় অসীমার দিদিই গোপনে তার মাকে জানিয়েছিল, ও চেষ্টা নিষ্ফল। কারণ সুপ্রকাশ এবং অসীমা পরস্পরকে ভালোবাসে। মামী তাতে দুঃখিত হননি। বরং আনন্দমিশ্রিত কৌতুকই অনুভব ক'রেছিলেন। বিবাহের প্রস্তাব আর উত্থাপিত হয়নি।

ওরা দুজন কিন্তু তা জানতো না। বরং ওদের দুজনের ধারণা ওদের মনের গোপন কথা ওরা দুজন ছাড়া সংসারে আর কেউ জানে না। গোপনতার একটা রহস্য আছে। সেই রহস্যের জন্যে বহু লোকের মধ্যেও

পরস্পরের সাহচর্য্যে ওরা একটা অনির্ব্বচনীয় বিশেষ আনন্দ উপভোগ করত।

অথচ সংসারে যারা অভিজ্ঞ ব্যক্তি, নিজের সংসার চালিয়ে এবং অন্যের সংসার চালাতে সাহায্য ক'রে যাঁরা মাথার চুল পাকিয়েছেন, তাঁদের কাছে ওদের দুজনের এই সম্পর্কের চেয়ে অবিশ্বাস্য এবং অসম্ভব ঘটনা আর কিছু নেই।

কেন বলি :

দেবীপুরের মুখুয্যে এবং চাটুয্যে উভয় বংশই সম্মানিত এবং সম্ভ্রান্ত বংশ। মুখুয্যেরাই গ্রামের আদি জমিদার। সাত পুরুষ আগে এই বংশের হরিহর এবং ধনঞ্জয় দুই ভাই ছিলেন। দুই ভাই যখন পৃথক হলেন তখন হরিহরের তরফ বড় তরফ এবং ধনঞ্জয়ের তরফ ছোট তরফ নামে অভিহিত হ'ল। ধনঞ্জয়ের পুত্র সন্তান ছিল না। একটি মাত্র কন্যা। কন্যাটির তিনি বিবাহ দিলেন নিজ গ্রামের বিশ্বনাথ বাঁড়ুয্যের সঙ্গে। মুখুয্যে বংশের অর্দ্ধেক সম্পত্তি বাঁড়ুয্যে বংশের হাতে চ'লে গেল, এটা মুখুয্যেদের পক্ষে প্রীতির বিষয় হ'ল না। এই সময় থেকেই বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে উভয় পরিবারে দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং গোলযোগ আরম্ভ হ'ল।

আরও দুই পুরুষ পরে বিশ্বনাথের পৌত্র শম্ভুনাথও একটি মাত্র কন্যা সন্তান রেখে মারা গেলেন। মারা যাওয়ার পূর্ব্বে তিনিও নিজ গ্রামের হরসুন্দর চাটুয্যের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে গেলেন।

মুখুয্যেদের অর্দ্ধেক সম্পত্তি আবার হাত বদলালো,—বাঁড়ুয্যে বংশ থেকে চাটুয্যে বংশে। কিন্তু তাতে মুখুয্যেদের মনোভাবের কোনো পরিবর্ত্তন হ'ল না। গোলযোগ যেমন চলছিলো তেমনি চলতে লাগলো।

এখনও উভয় পরিবারের মধ্যে গোটা তিনেক জটিল মামলা তার জটিলতর অসংখ্য শাখা-প্রশাখা নিয়ে তিন কোর্টের মধ্যে ঘোরাঘুরি করছে।

বিষয়-সম্পত্তি ভাগ হয়ে গেছে। রক্তের সম্পর্কও ছিন্ন হয়েছে। কিন্তু মামলার অচ্ছেদ্য বন্ধনে উভয় পরিবার এখনও বাঁধা রয়েছে।

আরও একটি বন্ধন আছে। কুলদেবতা সিংহবাহিনী এবং তাঁর দেবোত্তর সম্পত্তির বন্ধন।

ধনঞ্জয় এবং হরিহর একটা ব্যবস্থা ক'রে গিয়েছিলেন যে, দেবোত্তর সম্পত্তি ভাগ হতে পারবে না। উভয় পরিবারে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ তাঁরই হাতে থাকবে দেবোত্তর পরিচালনার ভার।

আরও একটা ব্যবস্থা আছে। পৃথক কোনো দুর্গা প্রতিমা আনার বিধান নাই। পূজা সিংহবাহিনী দেবীরই হবে। দুর্গা পূজার সাধারণ পদ্ধতিতেই পূজা সম্পন্ন হবে।

এই ব্যবস্থা বিবাদ-বিসম্বাদ, মামলা-মোকর্দ্দমা সত্ত্বেও আজও বলবৎ আছে।

সুপ্রকাশ মুখুয্যে বাড়ীর বর্ত্তমান জমিদার হৃষিকেশবাবুর একমাত্র পুত্র, এবং অসীমা চাটুয্যে বাড়ীর বর্ত্তমান জমিদার ধূর্জ্জটিবাবুর একমাত্র কন্যা।

সুপ্রকাশ কংগ্রেসের লোক। খদ্দর পরে, আন্দোলনের সময় জেলে যায় এবং অবসর সময়ে কংগ্রেসের কাজও কিছু কিছু করে। কিন্তু তাতে হৃষিকেশবাবুর সম্মতি এবং সমর্থন নেই। বরং তাঁর মতের বিরুদ্ধেই করে।

হৃষিকেশ, এবং ধূর্জ্জটিবাবুও, জমিদার লোক। কখনও প্রজার সঙ্গে, কখনও তাঁদের নিজেদের মধ্যে ফৌজদারী লেগেই আছে। হাকিম

থেকে আরম্ভ ক'রে দারোগা-কনেষ্টবল পর্য্যন্ত সকলেরই সঙ্গে তাঁদের মানিয়ে চলতে হয়।

সত্য কথা বলতে কি, এবারে হৃষিকেশবাবু এবং ধূর্জ্জটি বাবু দুজনের মধ্যে একটি অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট পদ নিয়ে প্রতিযোগিতা চলছিলো। হৃষিকেশবাবুর সম্ভাবনাই বেশি ছিল। কিন্তু ভেস্তে দিলে সুপ্রকাশ।

যেদিন সুপ্রকাশের জেলের খবর এল হৃষিকেশ বাবুর কাছে, সেইদিন ধূর্জ্জটিবাবুর কাছে এল অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিয়োগপত্র। এবং সেইদিন সন্ধ্যায় যখন চাটুয্যেদের কাছারীতে বাজনা বাজিয়ে উৎসব সুরু হ'ল, হৃষিকেশবাবুর সন্দেহ রইল না যে, এই আনন্দের অর্দ্ধেক অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের জন্যে আর অর্দ্ধেক সুপ্রকাশের জেলের জন্য।

অগ্নিগর্ভ পাহাড়ের মতো হৃষিকেশবাবু মনে-মনে গর্জ্জন করতে লাগলেন।

ধূর্জ্জটিবাবু মুখুয্যেদের কাছারীতে বড় একটা আসেন না। কিন্তু পরের দিন খুব ভক্তিভরে এসে হৃষিকেশবাবুর পায়ের ধূলো নিলেন।

হৃষিকেশবাবু উচ্চহাস্য ক'রে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন।

বললেন, আরে বিলক্ষণ! ধূর্জ্জটি, তুমি হ'লে গিয়ে একটা হাকিম লোক। কবে একদিন তোমার কাঠগড়ায় হাত জোড় ক'রে দাঁড়াতে হয়। আমি শুনেছি, সব শুনেছি। বোসো, বোসো।

ধূর্জ্জটিবাবু বিনীতভাবে বললেন, কী যে বলেন দাদা। যা হয়েছি, সে আপনাদেরই পাঁচজনের আশীর্ব্বাদে। কিন্তু এ কি শুনছি দাদা?

—কি শুনছ ভাই? হৃষিকেশবাবুর ললাটে ভ্রূকুটির রেখা মুহূর্ত্তের জন্য বুঝি বা পড়লো। কিন্তু তখনই মিলিয়ে গেল।

—সুপ্রকাশের নাকি জেল হয়েছে?

এবারে সকলকে সচকিত ক'রে হৃষিকেশবাবু অট্টহাস্য ক'রে উঠলেন:

—এই ব্যাপার ! আমি ভেবেছিলাম, কি বুঝি বা দুঃসংবাদ আছে। হাঁ ভাই, সুপ্রকাশ আমাদের মুখ উজ্জ্বল ক'রে জেলেই গেছে। খবরটা শুনে ভাবলাম, তোমার নহবতের সঙ্গে আমিও এ কাছারীতে একটা নহবৎ জুড়ে দিই। কিন্তু…

সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি।

ধূর্জ্জটিবাবু প্রথমটা চমকে গিয়েছিলেন। তার পর সামলে নিয়ে বললেন, কিন্তু আমাদের নিত্য হাকিম আর দারোগা নিয়ে কারবার। আমাদের ঘরে…

—এই কথা ! তুমি ঠিক ধরেছ। সেইজন্থেই তো নহবৎ আর বসালাম না। কিন্তু কথাটা কি জান ভায়া, আমাদের কারবার তো এবার গুটিয়ে আনার সময় হয়েছে।

গম্ভীরভাবে ধূর্জ্জটিবাবু বললেন, তা তো বুঝলাম দাদা। কিন্তু সরকার সাহেব যা কড়া ম্যাজিষ্ট্রেট, তিনি বোধ হয় এতে…

কিন্তু হৃষিকেশবাবু যেন ধূর্জ্জটিবাবুর কাছে হার মানবেন না পণ করেছেন।

ধূর্জ্জটিবাবুর মুখের কথাটা লুফে নিয়ে বললেন, খুশি হবেন না। তাও জানি। সেও এক পর্ব্ব আছে, তাঁকে খুশি করা। কিন্তু আসল কথাটা কি জান…

হৃষিকেশ যেন মস্ত বড় একটা গোপন রহস্য উদ্‌ঘাটন করবার জন্যে ভালো ক'রে নড়ে চড়ে বসলেন।

বললেন, কথা আর কিছুই নয়। আমরা, মুখুয্যেরা, তো দৌহিত্রসূত্রে জমিদারী পাইনি। এ আমাদের একদিন লাঠির জোরে দখল করে নিতে হয়েছে। লাঠি আর নেই, কিন্তু জোরটা যে এখনও রয়েছে, ছেলেদের রক্তে তার পরিচয় পেলে মনে বড় আনন্দ হয়। বুঝলে না ভায়া ?

ভায়া বুঝলেন কি না বোঝা গেল না। কিন্তু 'দৌহিত্রসূত্রে'র উল্লেখে কে যেন তাঁর মুখে কালি লেপে দিলে।

তিনি উঠতে উঠতে বললেন, কি জানি দাদা, কি ক'রে আপনার হাসি আসছে। আমার তো শুনে পর্য্যন্ত মনটা ভালো নেই। দুধের ছেলে, কে জানে এতক্ষণ ঘানিই টানছে, না দড়িই পাকাচ্ছে, কথায় বলে জেল!

—ও কি! উঠলে যে! একটু চা খেয়ে যাও।

হাত জোড় ক'রে ধূর্জ্জটিবাবু বললেন, আর একদিন এসে খাব দাদা। এ তো নিজেদেরই বাড়ী!

তিনি আর দাঁড়ালেন না।

হৃষিকেশবাবু আপন মনেই একটু কুটিল হেসে ভিতরে চলে গেলেন। বোধ করি, সরকার সাহেবকে কি ক'রে খুশি করা যায় তারই উপায় নির্দ্ধারণের জন্যে।

সুপ্রকাশ এবং অসীমা যখন ষ্টেশনে এসে পৌঁছুলো, তখন ট্রেন ছাড়ার বেশি দেরী নেই। ওরা টিকেট ক'রে একটা ইণ্টার ক্লাশের কামরায় যখন বসলো, তার মিনিট দুয়েক পরেই ট্রেন ছেড়ে দিলে।

পঞ্চমীর দিন ভিড় বড় হয় না। ভিড়টা ষষ্ঠীর দিনই বেশি হয়। ওরা যে কামরায় এসে উঠলো, তাতে পাঁচ-ছ'জনের বেশি লোক ছিল না। কিছুদুর গিয়ে তারাও নেমে গেল।

চারিদিক চাঁদের আলোয় ফুট ফুট করছে। অল্প ঠাণ্ডা, মিষ্টি হাওয়া এসে যেন গায়ে হাত বুলোচ্ছে। লাইনের পাশের কাটিংএর জলে চাঁদ যেন স্নান করছে। দুলে দুলে কাশ ফুলগুলি যেন তাকে ডাকছে।

অসীমা জিজ্ঞাসা করলে, তুমি যাচ্ছ, বাড়ীর লোকেরা জানেন?

সুপ্রকাশ হেসে বললে, কি ক'রে জানবেন? আজ সকাল ন'টা পর্য্যন্ত আমি নিজেই জানতাম না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য জানো, বেরিয়ে এসেই চারিদিকে চাইলাম তোমার খোঁজে। মনে হয়েছিল, যদি কোনো যাদুমন্ত্রে খবরটা জেনে তুমি উপস্থিত থাকো তো বেশ হয়।

—তবু তো পেলে আমায়। কিন্তু যদি আমি মহালয়ার দিনেই চলে যেতাম?

সুপ্রকাশ উর্দ্ধাকাশের বাঁকা চাঁদ, ঢেউ-খেলানো সবুজ ধানের ক্ষেত, কাশবনের দিকে চাইলে। বললে, ভারি বিশ্রী লাগতো তাহ'লে।

—অথচ মহালয়ার দিন না যাবার কোনো কারণ ছিল না। মামীমার অসুখ। কিন্তু সে কিছুই নয়। অথচ রয়ে গেলাম। এখন বুঝছি কেন?

—কেন বল তো?

—কি জানি কেন?—অসীমা জানালার বাইরে চেয়ে হাসতে লাগলো।

অসীমা আবার বললে, এবারে তোমার শরীর ভালো দেখাচ্ছে না তো।

—না। তুমি যেদিন দেখা করতে গেলে তার পরেই জ্বরে পড়েছিলাম। মোটে পাঁচ-ছ'দিন হ'ল পথ্যি করেছি।

একটা উদ্বিগ্ন দৃষ্টি ওর সর্ব্বাঙ্গে বুলিয়ে অসীমা জিজ্ঞাসা করলে, তাহ'লে? খবর দাওনি, পাল্‌কী আসবে না। অতখানি পথ এই শরীরে যাবে কি ক'রে?

—যেমন ক'রে যাই। মানে হেঁটে। পালকীতে কি কখনও গিয়েছি যে, আজ যাব?

—কিন্তু তোমার শরীর যে দুর্ব্বল।

সুপ্রকাশ হাসলে। বললে, এই শরীরেও তোমার স্যুটকেস, আমার স্যুটকেস, এমন কি তার উপরে তোমাকে চাপিয়েও ওই পথটা হেঁটে যেতে পারি। তা জানো?

কিন্তু এতেও অসীমা আশ্বস্ত হ'ল না। বিরক্তভাবে বললে, জানি। তুমি খুব বীরপুরুষ!

অসীমা নিঃশব্দে জানালার বাইরে চেয়ে রইল। সুপ্রকাশ তার একখানি হাত ধীরে ধীরে ওর কাঁধের উপর রাখলে। কিন্তু অসীমা তাতে সাড়া দিলে না। তেমনি নিঃশব্দে বাইরে চেয়ে রইল।

একটু পরে অসীমা বললে, আচ্ছা সামনের ষ্টেশনে নেমে বাড়ীতে একটা টেলিগ্রাম ক'রে দিলে কখন পাবে?

—আমরা বাড়ী পৌছবার আধ ঘণ্টা পরে।

অসীমা রাগতে গিয়ে হেসে ফেললে। বললে, আমাদের বাড়ী পৌছুতে আর কতক্ষণ লাগবে? এক ঘণ্টা? চমৎকার হবে। তোমার সামনে দিয়ে পাল্‌কী হাঁকিয়ে আমি চলে যাব। পিছু পিছু স্যুটকেস মাথায় ক'রে তুমি এসো। আর ভাবতে পারি না। শুই একটু।

অসীমা ক্লান্তিভরে সেইখানে শুয়ে পড়লো।

সুপ্রকাশ ওর মাথাটা সস্নেহে নিজের কোলের উপর তুলে নিলে। অসীমা বাধা দিলে না। শুধু একটু হাসলো।

কিন্তু ষ্টেশনে যখন ওরা নামলো, অসীমা কিছুতেই পাল্‌কিতে উঠলো না। শুধু দুজনের স্যুটকেস দুটো তাতে তুলে দিলে।

সুপ্রকাশ বললে, আর তুমি?

—আমি তোমার সঙ্গে হেঁটে যাব।

—চমৎকার! আর দু'জনেরই বাড়ীর কথা তো জানো।

অসীমা বিরক্তভাবে বললে, আমি কিছুই জানি না সুপ্রকাশদা। হাঁটবার কথা ভাবতেই আমার বিরক্ত লাগছে। কিন্তু এই রাত্রে তোমাকে একলা হেঁটে যেতে কিছুতেই দোব না। চলো।

ব'লে নিজেই আগে-আগে চলতে সুরু করলে।

গ্রামের স্বল্পবাস নিরীহগোছের লোকগুলিকে বাইরে থেকে দেখে যতটা বোকা মনে হয়, আসলে ততটা বোকা তারা নয়।

ধূর্জ্জটিবাবুর মেয়ের পক্ষে হৃষিকেশবাবুর ছেলের জন্যে এতখানি আগ্রহ প্রকাশ, নির্জ্জন মাঠের মধ্যে দিয়ে দুটি তরুণ-তরুণীর একেলা পথ-চলা তাদের ওষ্ঠপ্রান্তে একটা বাঁকা হাসি ফুটিয়ে তুললে। কথাটা গ্রামের মধ্যে পরের দিনই রাষ্ট্র হ'ল। এবং দুই বাড়ীর কর্ত্তার কানে পৌছুতেও বিলম্ব হ'ল না।

তাঁরা চেপে গেলেন। কিন্তু তাঁদের গৃহিণীরা শঙ্কিত হলেন। তাঁদের শঙ্কা হ'ল প্রতিবেশিনীদের জন্যে। জিহ্বা এ সব ব্যাপারে সাধারণতঃই অসতর্ক।

কথাটা সুপ্রকাশের এবং অসীমার কানেও গেল। সুপ্রকাশ বিরক্ত হ'ল এবং অসীমা গ্রাহ্যই করলে না। সুপ্রকাশ এত বিরক্ত হ'ল যে, মায়ের কাছে স্পষ্টই গিয়ে বললে, অসীমাকে সে বিয়ে করবে।

বললেন, বলিস কি রে! পাগল ছেলে! ওঁকে তো জানিস। চাটুয্যে বাড়ীর মেয়ে উনি কিছুতেই আনবেন না।

সুপ্রকাশ আর কিছু বললে না।

মহাসমারোহে সপ্তমী পূজা হয়ে গেল।

দেবোত্তরের পূজা। সেবাইত হিসাবে হৃষিকেশবাবু এবং ধূর্জ্জটিবাবু উভয়েই পট্টবস্ত্র প'রে উপস্থিত থাকেন। পরস্পরের মধ্যে মৌখিক কোনো

বিরোধ নেই। দেখলে বোঝার উপায় নেই, তাঁদের মধ্যে গোটা দশেক জটিল মামলা চলছে।

ধূর্জ্জটিবাবু বললেন, সুপ্রকাশের শরীরটা বড় খারাপ দেখলাম।

—হুঁ। বলছে, জ্বর হয়েছিল।

ধূর্জ্জটিবাবুর মুখে একটা কুটিল হাসির রেখা খেলে গেল।

বললেন, সরকার সাহেব বলছিলেন···

এমন সময় টেলিগ্রাফ পিওন একখানা টেলিগ্রাম দিয়ে গেল।

সই ক'রে হৃষিকেশবাবু টেলিগ্রামটা পড়তে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। টেলিগ্রাম পিওন তখনও দাঁড়িয়ে ছিল। হৃষিকেশবাবু তৎক্ষণাৎ চীৎকার ক'রে হুকুম দিলেন, ওকে ধুতি-চাদর আর পাঁচটা টাকা বকশিস দিতে।

ধূর্জ্জটিবাবুর পক্ষে ধৈর্য্য রক্ষা করা ক্রমেই কঠিন হচ্ছিল।

জিজ্ঞাসা করলেন, কি ওটা?

হৃষিকেশবাবু টেলিগ্রামটা তাঁর সম্মুখে ফেলে দিলেন।

টেলিগ্রামখানা পড়তে পড়তে ধূর্জ্জটিবাবুর মুখ কালো হয়ে উঠল। প্রিভিকাউন্সিলের মামলায় হৃষিকেশবাবু খরচাসমেত ডিক্রি পেয়েছেন।

হৃষিকেশবাবু বললেন, এর জন্যে একটা নহবৎ বসানো উচিত। কি বল ভায়া?

ভায়া সাড়া দিলেন না।

হৃষিকেশবাবু তাঁর নিজের বাড়ীর ফটকে নহবতের হুকুম দিলেন।

কিন্তু তখনই একটা চাকর এসে বললে, গিন্নীমা ডাকছেন।

টেলিগ্রামটা গিন্নিকে দেখাবার জন্যে হৃষিকেশবাবু উঠলেন।

ধূর্জ্জটিবাবুকে বললেন, একটু বোসো ভায়া। তোমার বৌদিদির তলব। অমান্য করার তো জো নেই।

হাসতে হাসতে হৃষিকেশবাবু চলে গেলেন। রাত তখন দশটা।

গৃহিণী নিচেই ছিলেন। হৃষিকেশবাবুকে তিনি উপরে নিয়ে এলেন।

বললেন; সর্ব্বকাশ কাণ্ড! সুপ্রকাশকে পাওয়া যাচ্ছে না।

—তার মানে?

—লক্ষ্মণ এসেছিল। বলছে, তাকে আর অসীমাকে সে ন'টার গাড়ীতে উঠতে দেখেছে।

—বল কি?

গৃহিণী সাড়া দিলেন না। হৃষিকেশবাবুর হাতে তখনও টেলিগ্রামের গোলাপী কাগজখানা যেন হাসছে।

বাইরে নহবৎ বাজতে সুরু করেছে।

তিন পুরুষের কাহিনী

মানুষের খেয়ালের অন্ত নাই। নহিলে অকস্মাৎ জুটমিল দেখিবার সঙ্কল্প করিয়া যে একদিন ট্রেণে চড়িয়া বসিব, একথা কে ভাবিয়াছিল!

ছিলাম প্রায় চার-পাঁচ জন। উঠিলাম এক বন্ধুর গৃহে। বন্ধুটি মিলেরই একজন উঁচুদরের কর্ম্মচারী। তিনি মিলের সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইলেন, আহার্য্য দিলেন, পানীয় দিলেন, ত্রুটি কোথাও রাখিলেন না। সুতরাং তাঁহাকে ধন্যবাদ।

হ্যাঁ, মিল বটে। প্রায় মাইল দুয়েক জায়গা জুড়িয়া যেন একটা নগর বসাইয়া দিয়াছে। বাবুদের বাসা, কুলিদের বাসা, রাস্তা, ঘাট, কলের জল, ইলেক্‌ট্রিক আলো কিছুই বাদ যায় নাই। একদিকে কয়েকটা বড় বড় হাতাওয়ালা বাংলো; সেগুলা শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীদের জন্য,—যেন একদল ব্রাহ্মণ নিজেদের শুচিতা বাঁচাইয়া দূরে ফলাহারে বসিয়াছে।

লোকেরও সংখ্যা নাই। ওখানে কয়েকটা বাঙ্গালীবাবু ছিন্ন মলিন বস্ত্রে টেবিলে বসিয়া হিসাব কষিতেছে, আর কয়েকটা কাণে পেন্‌সিল গুঁজিয়া কন্যাকর্ত্তার মতো ছুটাছুটি করিতেছে। সেখানে কয়েকজন মাথা গুঁজিয়া গভীর মনোনিবেশের সঙ্গে চটের উপর নম্বর দিতেছে; দূর হইতে ভাবিয়াছিলাম, ইহারা বুঝিবা একটা কিছু আবিষ্কারের চেষ্টায় আছে। একদল মাদ্রাজী কুলি-রমণী দল পাকাইয়া সেদিক হইতে এদিকে আসিতেছে। সাহেব-বাবু-কুলী, স্ত্রী-পুরুষ, যেন একটা মেলা বসাইয়া দিয়াছে।

এই মিল ! যেন একটা দৈত্যের বিরাট প্রাণস্পন্দনের মধ্যে দাঁড়াইয়া হাঁফাইতেছে···

যেন একটা স্যাম্‌সন্ দগ্ধ চোখ দুইটা বুজিয়া শক্তির অহঙ্কারে শিকল বাজাইতেছে···

যেন একটা সমুদ্র অধীর গর্জ্জনে পৃথিবীর শিরায়-শিরায় নিজের প্রাণস্পন্দন সঞ্চারিত করিতেছে···

স্যান্‌সনই বটে ;—যেন একগাছি চুলের মধ্যে সমস্ত শক্তি লুকাইয়া রাখিয়া মহামানবকে দাঁত বাহির করিয়া ভেঙচাইতেছে ; বলিলাম,—বাঃ ! এই বটে,—প্রাণ্‌স্পন্দনের গোমুখী !

বন্ধু হাসিলেন,—যেমন হাসে ভোরের বেলায় পাণ্ডুর তারা—বলিলেন, —এই নয়, আরও আছে,—হাঃ হাঃ, প্রাণস্পন্দনের গোমুখী !

সত্য। আরও আছে।

মিলের বাঁশী বাজিল,—বাঁশী তো নয়, যেন একটা ক্ষুধার্ত্ত শকুনের আর্ত্তনাদ !

ব্যাস্।

দৈত্যের প্রাণস্পন্দন থামিল···

স্যাম্‌সনের শিকলের ঝঞ্ঝনী বন্ধ হইল···

যেন ম্যাজিক !

খোলা গেট দিয়া হাজার হাজার স্ত্রী পুরুষ বাহির হইয়া আসিল। কী সর্ব্বনাশ ! একটা মস্ত পিঁজরাপোলের দ্বার খোলা পাইয়া দলে দলে মুমূর্ষু জানোয়ার পৃথিবীর বুকের উপর শোভাযাত্রা বাহির করিল না কি ?

যেন কলের কোলে সমস্ত রস নিঃশেষে নিঙড়াইয়া দিয়া হাজার হাজার ইক্ষুদণ্ড মাথায় পাগড়ী জড়াইয়া সান্ধ্য ভ্রমণে বাহির হইয়াছে।

কী ভয়ানক! যেন চুষিয়া খাইয়াছে!

বলিলাম,—এরা আবার কারা?

বন্ধু উত্তর দিলেন না। দূরে গুটি পাঁচেক বাবলা গাছের আড়ালে সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল, সেদিকে চাহিয়া রহিলেন।

এ দৃশ্য দেখা যায় না; চোখ জ্বালা করে।

বলিলাম,—চল ঐ পুকুরটার ধারে একটু বসা যাক্ গে।

ছোট্ট পুকুর। এদিকে বাঁধান ঘাট; ওদিকে কয়েকটা তালের গাছ পাখা নাড়িতেছে।

মন ভারি হইয়া গিয়াছে; যেন বর্ষার ভিজা হাওয়া।

কথা কওয়া যায় না।

কয়েকটা লোক নিঃশব্দে পুকুরে পা ধুইয়া চলিয়া গেল।—শুধু জলের শব্দ হইল থল্ থল্।

একটু দূরে একটা প্রকাণ্ড বাড়ী হাড় বাহির করা একশো বছরের বুড়ার মতো ফোকলা দাঁত বাহির করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

এদিকে—ওদিকে—সেদিকে কয়েকটা আশশ্যাওড়ার ঝোপ ভালুকের মতো জ্বরের ঘোরে ধুঁকিতেছে।

চারিদিকে মাঠ; দূরে দু'দিকে দুইটা মিল, রণশ্রান্ত ষাঁড়ের মতো গর্জ্জন করিতেছে।

মাঠময় চাঁদের আলো ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া আছে।

নিঃশব্দ।

বন্ধু বলিলেন,—এই পুকুরের ইতিহাস,—শুনবে ?

কথা কহিলাম না। ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম, শুনিব।

দূরের পোড়ো বাড়ীটার দিকে চাহিয়া বন্ধু বলিতে লাগিলেন :

একশো বছর আগে চারিদিকে যতটা দেখা যায়, এবং সম্ভবতঃ, যতটা দেখা যায় না তারও খানিকটা ছিল রায় বাবুদের জমিদারী। দুর্দ্ধর্ষ জমিদার ; যাদের ভয়ে বাঘে-বলদে এক ঘাটে জল খেত।

তারও আগের ইতিহাস ? ঠিক জানিনে। তবে সে বোধ হয় ডাকাতি, কিম্বা লাঠির জোরের কাহিনী এমনি একটা কিছু হবে। তাদের রক্তে ডাকাতের বীজ আছে। তাতেই মনে হয়······

কিন্তু, সে যাক্।

একশো বছরের ইতিহাস,—ভালো জানা যায় না। ওই গাঁয়ের এক বুড়োর কাছে শোনা। তিন পুরুষের ইতিহাস সে জানে।

বলে, মিল তো সেদিনে হোল বাবু ; সবাই দেখেছে। তখন এই সমস্তটা জায়গা ছিল জঙ্গল। দিনে লোকে যেতে ভয় পেত। তারও আগে ওখানে ছিল গাঁ। কতই বা লোক হবে ! ঘর কতক তাঁতী, কয়েক ঘর চাষী, কিছু বামুন-কায়েত ভদ্রলোক। চারিদিকে মাটীর ঘর, খড়ের চাল, মধ্যেখানে বাবুদের প্রকাণ্ড বড় রাজবাড়ীর মতো বাড়ী। কিছুই তো রইল না বাবু ; রইল শুধু বাবুদের ওই জিরজিরে একটুকরো দালান আর ওই খিড়কীর পুকুরটুকু।

বন্ধু চুপ করিলেন।

রাত্রির কালো জলের উপর ঢেউয়ের লীলা ;—বেশ লাগে।

ভাবিলাম, তাই বটে ! চারিদিকে পাঁচীল-ঘেরা ছোট্ট একটুখানি খিড়কীর পুকুর। হয় তো তখন ছিল পদ্মফুলে ভরা। বাবুদের বাড়ীর

সুন্দরীরা হয় তো ওইখানে বুক ডুবাইয়া বসিতেন। কোটি কোটি পদ্মের পরাগকণা ঢেউয়ের দোলায় দুলিতে দুলিতে বুকে আসিয়া স্পর্শ করিত। খিড়কীর পুকুর ; লজ্জাই বা কি, মাথার-বুকের কাপড় যদি খুলিয়াই যায়। হয় তো ছোট্ট ছোট্ট ফুলের মতো খুকীরা ঘড়া নিয়ে ওই অতদূর অবধি সাঁতারও দিত। এই যে ঘাট, ইহার উপর আলতা-পরা কতগুলি চরণ পদ্মফুলের মতো শোভায়-শোভায় ফুটিয়া উঠিত, কে জানে। এই আলিসা, হয় তো সন্ধ্যার সময় চাঁদিনী রাত্রে ইহারই উপর বসিয়া কচি কচি বধূগুলি চুপে চুপে গত রাত্রের গল্প করিত। হয় তো, অনেক কথা শুনিয়াছে, এই ফুলে ভরা লেবুগাছটি। সেদিনও হয় তো এমনি করিয়া ইহার ফুলগুলি নিঃশব্দে বধূগুলির কবরীর উপর ঝরিয়াছিল। অতি মমতায়, সন্তর্পণে তাহার দুইটা পাতা স্পর্শ করিলাম।

অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলাম,—আর সেই বাবুরা!

—সেই কথাই বলব ; বাবুদের শেষ তিন পুরুষের ইতিহাস। বলিয়া একটু থামিয়া বন্ধু ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন :

শেষ দুর্দ্ধর্ষ জমিদার বলতে হোলে ব্রজেন্দ্রবাবুকেই বলতে হয়। লম্বা-চওড়া চেহারা, ফুটফুটে রং, গোঁফ দাড়ি কামানো। দুটি পাতলা ঠোঁট দৃঢ় সম্বদ্ধ, উন্নত ললাট। বুড়োর কাছে শুনেছি।

বুড়ো বলে, এমন গোঁয়ার দেখিনি, বাবু। জ্যান্ত মানুষ থামের সঙ্গে গেঁথেছে।—চুপি-চুপি বলে ; এখনও তার ভয় যায় নি।

শিহরিয়া উঠিলাম!

—জ্যান্ত মানুষ থামের সঙ্গে গেঁথেছে কি?

—তাই গেঁথেছিল। কিন্তু, তাতে চমকাবার কিছুই নেই। সেকালে এমন ঘটনা বিরল ছিল না। বলতো, প্রজা শাসন না করলে জমিদারী চলে না। ব্যাপার এমন কিছুই নয়। ব্রজেন্দ্রবাবুর মেয়ের বিয়ে। একটি ছোকরা, বোধ করি সে কলকাতায় পড়ে birth rightএর সন্ধান পেয়েছিল। গ্রামে ফিরে এসে প্রজাদের মধ্যে আন্দোলন চালাতে সুরু করলে। বল্লে, জমিদারের মেয়ের বিয়ে, তাতে প্রজা কেন তার খরচ বইবে? প্রজার মেয়ের বিয়ে হ'লে জমিদার তার খরচ বয়? জমিদার তাকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসে খুন করে একদম থামের সঙ্গে গেঁথে ফেলে।

আবার কেউ বলে……কিন্তু, সে থাক্ গে, সে একটা অবৈধ প্রেমের কাহিনী, যার সঙ্গে জমিদার দুহিতার না কি সংশ্রব ছিল।

মোট কথা, এরই ফলে জমিদারের অর্দ্ধেক সম্পত্তি বন্ধক গেল। তা যাক, কিন্তু সম্পত্তি দিয়ে পাপ ঢাকা পড়ল। পুত্র হারার চোখের জল? দুনিয়ার কত হতভাগ্যের চোখের জল অহর্নিশি ঝরছে তার সন্ধান রাখতে গেলে পাগল হ'য়ে যেতে হয়।

সম্পত্তি অর্দ্ধেক গেল, কিন্তু চাল সমানই রইল; বরং মেকিকে আসল বানাতে গিয়ে মাজাঘষা বেড়েই গেল। ফাঁকির বাজারেই তো আড়ম্বরের রেওয়াজ বেশী। নইলে দাঁড়ি পাল্লা ঠিক থাকে না।

বল্লাম না, এদের রক্তে ডাকাতের বীজ আছে।

ব্রজেন্দ্রবাবু ছিল যেন সে যুগের মোগল বাদশা;—সে যেন হুকুম করবার জন্যেই জন্মেছিল। তার বড় বড় টানা টানা চোখ, আর পাতলা দুটি ঠোঁটের সামনে দাঁড়িয়ে অতিবড় দুঃসাহসীরও ঠোঁট বন্ধ হ'য়ে যেত;—এমনই রাশভারী।

কেনারাম মণ্ডলের ছেলে কলকাতায় পড়তে গিয়ে ইংরিজি চুল ছেটে এল। ব্রজেন্দ্রবাবু কেনারামকে সদরে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলেন,—বাবু, তোমার ছেলেটি কোথায় ?

কেনারাম পুত্র-সৌভাগ্যের গর্ব্বে উল্লসিত হ'য়ে বাবুকে প্রণাম করে বললে,—আজ্ঞে, তাকে কলকাতায় পড়তে পাঠিয়েছি। তার মুখের যদি ইংরিজি শোনেন, বাবু······

এতগুলি কথা এক সঙ্গে বাবুর সামনে বলবার সৌভাগ্য কেনারামের কখনও হয় নি।

বাবু মধ্য পথে থামিয়ে বল্‌লেন,—সে আর একদিনে হবে বাবু। আপাততঃ তার মাথাটা কামিয়ে দাও ; আর ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে কৃষিকর্ম্মে লাগাও।

কেনারাম তো অবাক্ !

তার ইচ্ছে ছিল, জিজ্ঞেস্ করে, কেন ? কিন্তু বাবুর চোখের পানে তাকিয়ে যেন সংস্কারের বশে বল্‌লে—যে আজ্ঞে।

—যাও, এই জন্যই ডেকেছিলাম।

তারপরে সুরু হোল ভাঙ্গন।

ব্রজেন্দ্রবাবুর ছেলে মহেন্দ্রবাবু। কিছুদিন কলেজে পড়েছিলেন। সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা, সোশ্যালিজম্ সম্বন্ধেও তাঁর পড়া ছিল। পড়া ছিল বল্‌লে কম বলা হয়, দুনিয়ার ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট অধিকার ছিল।

যেন ভুলে এই বংশে জন্মেছিলেন ;—বিধাতার ভুল। বাপের মতো

টানা-টানা চোখ,—উজ্জ্বল, তেজস্বী; কিন্তু ঠোঁট দুটিতে সরলতা মাথানো ;—আশ্চর্য্য সম্মিলন !

পড়াটা ছিল তাঁর রোগ বললেই হয়। তাই ছেলের পড়ার দিকেই তাঁর দরদ ছিল বেশী।

এইটেই তাঁর জীবনের ট্রাজেডি।

বেশীদিনের তো কথা নয়! সবাই জানে, কি খরচটাই তিনি করেছিলেন, এই একটি মাত্র ছেলের পেছনে।

এখন তিনি থাকতেন কলকাতাতেই। কিছুদিন আগেই গ্রামে এমন ম্যালেরিয়া সুরু হয় যে, গ্রাম উজাড় হ'য়ে গেল। যা দু'চার ঘর ছিল, কেউ এখানে কেউ সেখানে পালিয়ে বাঁচল। জমিদার চলে গেলেন কলকাতায়। তার পরে, না ফিরে এলেন তিনি, না এল তাঁর প্রজারা।

মাটীর ঘর দু'দিনের অনাদরেই ঝুর ঝুর করে মাটির বুকে ঝরে পড়ল। বাবুদের দালান ক্রমে ক্রমে ধ্বংস হ'য়ে যেতে লাগল। আজ আর বোঝাও যায় না, এখানে ছিল গ্রাম।

যেন উপকথা! যেন মরণ কাঠির স্পর্শে এক মুহূর্ত্তেই সমস্তটুকু মরে গেল! জীয়ন কাঠি? —কে জানে?······সে দরদী কই?

ঋণ ক্রমে বেড়েই চলে; যেন আসলের নাগাল ধরতে রেস দিচ্ছে।

দুর্ভাবনায় মহেন্দ্রবাবুর রক্ত মগজে ওঠে; রাতে ঘুম হয় না। হায় রে, তবু কাউকে মুখ ফুটে বলবার পথ নেই,—মানুষের সম্ভ্রম এমনি ঠুনকো; হাওয়ার ভারে মাটিতে নেতিয়ে পড়ে। এই তো জীবনের ট্রাজেডি! বুক ফেটে যায়, তবু কাঁদবার উপায় নেই;—যেন চোরের মা।

ছেলে বলে, বাবা, আজকে হেডমাষ্টারের farewell; আমি চাঁদার খাতায় দশ টাকা সই করে এসেছি।

বাপের বুক কেঁপে ওঠে। তবু ছেলের মাথাটিকে বুকের কাছে টেনে বলেন,—বেশ তো, নিয়ে যেও।

হায় রে বলা কি যায়! এই চারু, সুকুমার, লাবণ্য-ঢল-ঢল শিশুকে বলা কি যায়, যে নেই, টাকা নেই! দুঃখের আগুনের স্পর্শ থেকে একে তো বাঁচাতেই হবে! সোণার চেন বাঁধা যদি যায় তো যাক্। সে সইবে খুব;—সইবে না এই অস্ফুটন্ত পুষ্পকোরকটিকে তপ্ত কড়ায় ছেড়ে দেওয়া। না, না, না, বাপের প্রাণে সব সইতে পারে, কিন্তু একমাত্র পুত্রকে দুঃখ দেওয়া তার সইবে না।

পাওনাদার আসে,—বলে,—আর তো পারা যায় না মহেন্দ্রবাবু, সুদ যে আসলকে ছাড়িয়ে যায়।

মহেন্দ্রবাবু মহাসমাদরে তাকে পাশে বসিয়ে বলেন,—যাক্ না ছাড়িয়ে, দেখি কতদূর ছাড়ায়। এমনই কি বেশী হয়েছে সুদ?

পাওনাদার চোখ কপালে তুলে বলে,—বলেন কি মশাই? আপনার জমিদারী বেচলে কত দাম হবে জানেন?

শিউরে ওঠেন মহেন্দ্রবাবু! জমিদারী বেচলে? কি বলে ও! কত দিনের কত পুরুষের রক্ত দিয়ে তৈরী এই জমিদারী, এ যাবে পরের হাতে, ঋণের দায়ে? কত দাম এই জমিদারীর? হাসিও আসে। মাথায় পাগড়ী বেঁধে সুদের সুদ আদায় করা যার পেশা, জীবনটা যে টাকা-আনা-পাই দিয়ে হিসেব মিলিয়ে রেখে দিয়েছে, সে জানবে জমিদারীর দাম! এ কথার উত্তর নেই।

পাওনাদার বলে,—শোধ করবার ইচ্ছে যদি থাকতো মশাই, তা'হলে

চাল কমিয়ে ঋণের আল বাঁধতেন। ঋণে যার গলা ডুবে, তার মোটরে চড়ে হাওয়া খাওয়াও মানায় না, ছেলের পেছুনে তিনটে মাষ্টার রাখাও মানায় না।

দু'চোখে আগুন জ্বলে ওঠে! যা মনে আসে তাই যে বলে এ!

তাই তো বলে। বলে,—যা ভালো বোঝেন করুন। আমি আরও মাস দুই অপেক্ষা করব। তারপরে······

বুক জ্বালা করে,···কাঁদতে ইচ্ছা হয়···

কোথায় অশ্রু! দু চোখে ডাকাতির আগুন ঝল্‌কে উঠে! যেন শুকতারাতে আগুন লেগেছে।

একটু পরেই হাসি আসে। মনে-মনেই বলেন,—অতি ছোট এরা। এদের ওপরও রাগ করে! এদের ছোঁয়া লাগলেও মন অশুচি হয়ে যায়।

গায়ের জামা-কাপড় ছেড়ে ফেলে বেয়ারাকে দিয়ে দেন। বলেন,—এগুলো তুই পরিস, আর ওই চেয়ারটা···চেয়ারটাকে···যা হয় করিস্‌··· ওটাকে জ্বালিয়েই ফেলিস।

গৃহিণী বলেন, তুমি দিন-দিন কি হয়ে যাচ্ছ?

মহেন্দ্রবাবু হাসেন, যেন ঝরা-গোলাপের পাপড়ি। বলেন—কি হয়ে যাচ্ছি?

—তা কি টের পাওনা? চোখের কোণে কালি পড়েছে, রং হয়েছে ফ্যাকাসে। তোমার পানে চাওয়া যায় না। যতই দেখ্‌ছি, বুকের রক্ত যেন জল হয়ে যাচ্ছে। কেন অত ভাব?

কান্নায় স্বর অবরুদ্ধ হয়ে আসে।

আদর করে কাছে টেনে এনে মহেন্দ্রবাবু বলেন,—কিছু ভাবিনে, কিছু হইনি, তোমার মিথ্যে ভয় সুরমা, আমি বেশ আছি।

—ওগো, আমায় মিথ্যে আশ্বাস দিও না। ফাঁকি দিয়ে আমার চোখ এড়ান যায় না। কি তোমার দুঃখ আমায় বল।

হায় রে, দুঃখের কি সীমা আছে ;—সমুদ্র। কোন্‌টা বলবেন, কোন্‌টা বলা যায়! তবু আনন্দে মহেন্দ্রের দৃষ্টি ঝাপ্সা হয়ে যায়।

—বল, আমায় বল, কোথায় তোমার ব্যথা! ঋণের কথা ভাব? কত সে ঋণ? আমার গহনাগুলো যদি……

এবারে হাসি আসে! মনে মনে মহেন্দ্রবাবু বলেন,—ওগো কত তোমার গহনা, কতই বা তার দাম! সমুদ্র বোজাতে চাও মুঠো-মুঠো বালু দিয়ে! মহেন্দ্রবাবু চুপ করেই থাকেন।

কিন্তু যার চোখের সামনে স্বামীর দেহ দিনে-দিনে তিলে-তিলে শুকিয়ে যায়, চুপ করে কি তাকে এড়ান যায়! সুরমা ছাড়েন না, বলেন,—তাতেও শোধ যাবে না? চুপ করে থেকো না। আমার কথার উত্তর দাও।

—তুমি কেন ব্যস্ত হও, সুরমা। আমি সেজন্যে মোটে ভাবিনে। সে ঠিক হয়ে যাবে অখন।

সুরমা তবু ছাড়েন না, বলেন,—হ্যাঁ, ঠিক হবে,—ছাই ঠিক হবে। আমি জানি, আমার কপাল ভাঙ্গবে। না, না, সে হবে না। তুমি যে আমারই চোখের সুমুখে দিন-দিন শুকিয়ে যাবে, সে হোতে দোব না। যেমন করেই হোক, ঋণ শোধ দিতেই হবে।

নারীর সরলতায় হাসি আসে। বলেন,—কিন্তু সে কি করে শুনি।

মাথা দুলিয়ে সুরমা বলেন,—সে আমি জানিনে। কিন্তু, যেমন করেই হোক ;—সর্ব্বস্ব বাঁধা দিয়েও।

মহেন্দ্র দুষ্টুমির হাসি হেসে বলেন,—আমার সর্ব্বস্ব বলতে তো তুমি। কিন্তু, তোমাকে বাঁধা দেবার জায়গা…

লজ্জায় সুরমার মুখ রাঙা হয়ে ওঠে,—পঞ্চদশী নববধূর লজ্জা। বলেন,—যাও। আমি নাকি তাই বলছি। আচ্ছা, জমিদারী…

আর্ত্ত কণ্ঠে মহেন্দ্রবাবু বলেন,—জমিদারীর কি করতে বল?

অস্ফুট স্বরে সুরমা বললেন,—যদি বিক্রি…

মহেন্দ্রবাবুর চোখে আবার আগুন জ্বলে ওঠে।

ভয়ে-ভয়ে সুরমা বলেন,—ওগো, তুমি রাগ কোরো না। জমিদারী দিয়ে যদি তোমায় ফিরে পাই, সেই আমার ঢের। আমার আর কে আছে। সুরমার চোখ ছাপিয়ে হু হু করে অশ্রু ঝরে।

মহেন্দ্রবাবু শান্ত কণ্ঠে বলেন,—খোকা বুঝি এল সুরমা। তার খাবার দাও গে।

কারো দুঃখ কেউ বোঝেন নি। সুরমা বোঝেন নি কোথায় স্বামীর ব্যথা; মহেন্দ্রও বোঝেন নি কোথায় সুরমার ব্যথা।

এমনি ভুল বোঝার মধ্যে দুজনের মাঝে বেড়ে ওঠে ব্যবধান।

আর খোকা? সে কারও দুঃখই বোঝে নি। তার আবদার সমানে চলেছে। হুহু করে জলের মতো টাকা খরচ হয়।

সেদিন দোল পূর্ণিমা। রঙের ধূম লেগেছে।

খোকা মুঠো-মুঠো আবীর নিয়ে বাপের জামা-কাপড় রঙে ভরিয়ে দিচ্ছিল। রঙই দিচ্ছে, রঙই দিচ্ছে, যেন রঙ দেওয়ার আর শেষ নেই।

হঠাৎ দোরের পর্দা ফাঁক করে সুরমা ডাকলেন, খোকা। বলেই চলে যাচ্ছিলেন।

কিছুদিন থেকেই স্বামী-স্ত্রীতে কথা বন্ধ।

কি মনে হোল, মহেন্দ্রবাবু দোরের কাছ পর্য্যন্ত গিয়ে ডাকলেন,—শোন।

মুখ না ফিরিয়েই সুরমা বললেন,—বল।

গলার স্বর নামিয়ে মুখে হাসি এনে মহেন্দ্র বললেন,—আজকে দোল।

—সে জানি,—বলেই সুরমা চলে গেলেন।

হতভম্বের মতো মহেন্দ্র তার প্রতিধ্বনি করলেন,—সে জানি। দোরের কাছে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

শেষ, শেষ, শেষ!……

সুরমাও তার কাছ থেকে সরে যেতে চায়। পোনের বছরের দোলও পথের মধ্যে এমনি করে হঠাৎ থেমে যায়,—এমনি তুনিয়া!

আস্তে আস্তে মহেন্দ্রবাবু তাঁর আসনে এসে বসলেন।

পোনের বছরের পোনেরটি দোলপূর্ণিমার স্মৃতি…

জমিদারী…জমিদারী…জমিদারী। সকলের নজর পড়েছে এই জমিদারীর ওপর; পাওনাদারেরও, সুরমারও। দাঁতে দাঁত টিপে মহেন্দ্র বললেন, কিন্তু একে বাঁচাবোই সকলের লুব্ধ দৃষ্টি থেকে।

খোকা বললে,—মাথা নামাও না, বাবা। আমি তোমার মাথায় রঙ দিতে পারছি না যে।

বাইরে পায়ের শব্দ হোল।

মহেন্দ্র শক্ত হয়ে বসলেন। আপন মনে বললেন, আসুক সুরমা। দোলের স্মৃতি আমিও ভুললাম।

পর্দ্দার ফাঁকে উঁকি দিল একযোড়া গোঁফ।

পাওনাদার কৃতার্থের মতো হেসে বললে,—খবর দিয়ে আসিনি,—পাছে বলে পাঠান, বাড়ী নেই।

তবে সুরমা নয়। মহেন্দ্র ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন। কি বলে এ!

পাওনাদার বলতে লাগল,—জুগিস সাহেবের সঙ্গে কথা কয়ে এলাম। তিনি জুটমিল খুলতে চান, এ খবর সত্যি।

—বাঁচা গেল। কিন্তু, আমায় কি করতে বলেন?

—তিনি আপনার জমিদারীটা কিনতে রাজি হয়েছেন। সাত লাখ টাকা পর্য্যন্ত উঠেছেন, আরও লাখখানেক খুব টেনে টুনে ধরলে হয়তো উঠতে পারেন।

মহেন্দ্রবাবু চেয়ারের দুটা হাতা দু'হাতে শক্ত করে চেপে ধরলেন। তাঁর চোখ দুটো দপ্ ক'রে জ্বলে উঠলো।

আপনমনে পাওনাদার বলে চললো,—এর চেয়ে বেশী দাম আপনি যতই চেষ্টা করুন পাবেন না। কি বলেন, আমি কথা দিয়ে আসি।

আঘাত···আঘাত···আঘাত···

তাকে নিতান্ত অসহায় পেয়ে অতি ছোট যে সেও আঘাত দেবার স্পর্দ্ধা পেয়েছে! কিন্তু আঘাত সওয়ারও সীমা আছে।

—একটু বসুন, আমি আসছি।

মিনিট দশেক পরে মহেন্দ্রবাবু ফিরে এলেন।

সঙ্গে সঙ্গে গোটাকয়েক পিস্তলের আওয়াজ হোল।

খোকা আর্ত্তনাদ করে উঠল।

দাস-দাসী, লোকজন ছুটে এসে দেখলে, সেই ধূমাকীর্ণ ঘরের তুকোণে তুজনের দেহ ছট্‌ফট্‌ করছে।

ভলকে-ভলকে রক্ত, ঘর ভেসে যায়···

কতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিলাম জানি না। কাছে এবং দূরে কোনও শব্দ নাই।

শুধু দূরে তুদিকে তুইটা মিল নিঃশব্দে ধূম উদ্গীরণ করিতেছে।

পুকুরের নিস্তব্ধ জলে একটা ব্যাং লাফাইয়া পড়িল—টুপ্‌।

বলিলাম, চল, ওঠা যাক্‌।

নিঃশব্দে তুজনে পথ চলিতে লাগিলাম।

হঠাৎ একসময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম,—আর খোকা?

বন্ধু চমকাইয়া উঠিলেন,—কে খোকা?

—খোকা আজও বেঁচে আছে?

—এই মিলেই চটের ওপর নম্বর দেয়।

বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল···

আজও দোল। কুলীদের মধ্যে এখনও দোলের উন্মত্ত কদর্য্য কোলাহল থামে নাই। এক বৎসরের দোল এক দিনেই ইহারা বুঝি খেলিয়া লইতে চায়।

একদল কুলিবালক নিরীহ ভালোমানুষ ভাবিয়া আমাদের গায়ে রঙ দিতে ছুটিয়া আসিল। বোধ করি বন্ধুকে দেখিয়াই অকস্মাৎ থমকিয়া

দাঁড়াইল। "বাপ্‌পা হো, বড়াবাবু" বলিয়াই চীৎকার করিয়া যে যে-দিকে পারিল ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইয়া গেল। শুধু একটা বছর দশেকের ছেলে দুই হাতে নর্দ্দমায় ভেজান ন্যাকড়া লইয়া বুঝি সঙ্গীদের কাণ্ড দেখিয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

আমি গম্ভীরভাবে বলিলাম,—এইও বাচ্চা, রঙ মৎ দেনা।

ছেলেটি তাহার বড়-বড় টানা চোখ দুইটা মেলিয়া বলিল,—আমি তোমার গায়ে রঙ দিই নি।

বা রে! বাংলা বলে!

অকস্মাৎ পিঠের উপর একটা ন্যাকড়া পড়িল ;—কি দুর্গন্ধ! ছেলেটি কদর্য্য চীৎকার করিতে করিতে অন্ধকারে মিশিয়া গেল।

বন্ধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—ওটি খোকার ছেলে।

জ্যাঠামশাই

বরেন্দ্রশঙ্কর শিবশঙ্করের বৈমাত্র ভায়ের ছেলে। কিন্তু বাইরে থেকে তা বোঝবার উপায় নেই।

মাত্র একটা মাঠের দু'পাশে দু'জনের বাড়ী। দু'খানা বাড়ীই মস্ত বড়। কিন্তু এই একটা মাঠের ব্যবধান কেন যে কিছুতেই লুপ্ত হ'ল না সে কথা জানতে গেলে আগের ইতিহাস জানা প্রয়োজন।

রায় বংশ বহুকাল থেকে এই গ্রামে বাস ক'রে আসছেন। ধনী এবং প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার ব'লে তাঁদের খ্যাতি বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। শিবশঙ্করের পিতা বরদাশঙ্করের সময়েও সেই খ্যাতি ক্ষুণ্ণ হয়নি। এর প্রধান কারণ, তাঁদের বংশে পুত্র-সন্তানের সংখ্যা বরাবরই অল্প। কোনো পুরুষেই শেষ পর্য্যন্ত একটির বেশী সন্তান বাঁচেনি।

শিবশঙ্করের বয়স যখন নয়-দশ বৎসর তখন তাঁর মাতৃ-বিয়োগ হয়। বৎসরান্তে বরদাশঙ্কর পুনরায় দার পরিগ্রহ করেন। এবং বৎসর দুই-তিন পরে বরেন্দ্রশঙ্করের পিতা দিব্যেন্দুশঙ্কর জন্মগ্রহণ করেন।

বিমাতা কোনো দিনই শিবশঙ্করকে স্নেহের চক্ষে দেখতে পারেননি। দিব্যেন্দুশঙ্করের জন্মের পর তিনি পিতার আদর থেকেও বঞ্চিত হলেন। তখন তাঁর বয়স তেরো-চৌদ্দ বৎসর। বাড়ীতে আর তৃতীয় কোনো আত্মীয় না থাকায় তখন থেকেই তিনি নিঃসঙ্গ। সেই নিঃসঙ্গতা দূর করবার জন্যে তাঁকে বাইরে থেকে সঙ্গী সংগ্রহ করতে হয়েছিল।

এ জিনিসটা এ বংশে এই প্রথম। বংশের আভিজাত্য রক্ষা করবার

জন্তে তাঁদের বংশে কেউ কখনও বাইরের কারও সঙ্গে সমানে-সমানে মিলতেন না। সমবয়সীর অভাব এই বাড়ীতে চিরকালই। কিন্তু জনক-জননী ও পরিবারভুক্ত অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের স্নেহে সঙ্গীর অভাব কাউকে বোধ করতে হয়নি। জনক-জননীর স্নেহের অভাবেই যে বালক শিবশঙ্করকে বংশের চিরাচরিত প্রথার ব্যতিক্রম করতে হয়েছিল এ কথা অনুমান করা যায়।

এর জন্তে তাঁকে তিরস্কার, লাঞ্ছনা এবং নির্য্যাতন যথেষ্ট সহ্য করতে হ'ত। দুর্দ্দান্ত বলিষ্ঠ বালক নিঃশব্দ ক্রোধে সেই অত্যাচার সহ্য করত। এর ফল হয়েছিল এই যে, শিবশঙ্কর দিব্যেন্দুশঙ্করকেই তার লাঞ্ছনা ও অনাদরের কারণ ব'লে অনুভব করতে লাগলেন। প্রাচীন দাসীমহল এবং বাইরের সঙ্গীমহল থেকে এই অনুভূতিকে বেগবান করার প্রয়াসেরও অভাব ঘটেনি।

আর একটি বিষয়েও শিবশঙ্কর এই বংশের চিরাচরিত প্রথা অতিক্রম করেছিলেন। সেটি বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে। এ বংশে পাঠশালে যাওয়া প্রথা ছিল না। কারণ সেখানে আরও পাঁচজন বাইরের ছেলের সঙ্গে মিশতে হয়। একজন পণ্ডিত এসে ছেলেদের পড়িয়ে যেতেন। এই পড়া কোনো ক্ষেত্রেই প্রয়োজনের অতিরিক্তকে অতিক্রম করেনি। কঠোর হস্তে জমিদারী চালাবার জন্তে যেটুকু শিক্ষা নিতান্ত অপরিহার্য্য ছিল, কোনো বালক বাহুল্যবোধে তার বেশি আর কিছু গ্রহণ করেনি। শিবশঙ্কর সেই সাধারণ প্রথার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। পণ্ডিত মহাশয়ের যতটুকু বিদ্যা ছিল সমস্ত তিনি নিঃশেষে নির্দ্দয়ভাবে শোষণ করে নিতেন। পণ্ডিত মহাশয়ের পড়া শেষ ক'রে শিবশঙ্কর ইংরেজী পড়বার জন্তে একজন শিক্ষকও রেখেছিলেন। বরদাশঙ্কর ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তাতে সম্মত হতে বাধ্য হয়েছিলেন।

নির্দ্দয়তা শিবশঙ্করের চরিত্রে একটা বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিল। কি সঙ্গীদের সঙ্গে খেলার ক্ষেত্রে, কি পড়াশুনায়—কোথাও তাঁর মনে দয়ার লেশমাত্র ছিল না। নিত্য নতুন নির্দ্দয় খেলার তিনি ছিলেন আবিষ্কারক। এই নির্দ্দয়তা পড়ার ক্ষেত্রে সুপরিস্ফুট ছিল। বলিষ্ঠ শিশু যেমন নিষ্ঠুরভাবে মাতৃস্তন্য পান করে, শিক্ষকের কাছ থেকেও তেমনি নির্দ্দয়ভাবে তিনি বিদ্যা আহরণ করতেন।

এই নির্দ্দয়তাই একদিন তাঁর জীবনের গতি অপ্রত্যাশিত ভাবে পরিবর্ত্তিত করেছিল।

বিমাতার নির্দ্দয়তায় এবং পিতার ঔদাসীন্যে তার মনে কোমলতা প্রশ্রয় পায়নি। তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ দিব্যেন্দুশঙ্করের উপর তাঁর যেন একটা জাতক্রোধ বেড়ে উঠেছিল। অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে সেই ক্রোধ একদিন আত্মপ্রকাশ করলে।

একদিন দেখা গেল, সন্ধ্যার অন্ধকারে একটা কাপড় দিয়ে মুখ বেঁধে শিবশঙ্কর দিব্যেন্দুশঙ্করকে তুলে নিয়ে যাচ্ছেন, বাগানের ইঁদারার দিকে। দিব্যেন্দুর পরমায়ু ছিল। বাড়ীর চাকরদের কে যেন দেখতে পেয়েই চীৎকার ক'রে উঠলো। আলো নিয়ে লোক ছুটলো। একটা ঝোপের দিকে মুখ-বাঁধা অবস্থায় দিব্যেন্দুকে পাওয়া গেল। কিন্তু শিবশঙ্করকে কোথাও পাওয়া গেল না।

শিবশঙ্করের বয়স তখন আঠারো-উনিশ।

কুড়ি বৎসর পরে শিবশঙ্কর গ্রামে ফিরে এলেন।

বরদাশঙ্কর তখন পরলোকে। বিমাতা তখনও জীবিত। পৈতৃক

গৃহে শিবশঙ্কর স্থান পেলেন না। জানা গেল, বরদাশঙ্কর তাঁর উইলে শিবশঙ্করকে সম্পত্তির অংশ থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত ক'রে গেছেন। তিনি পিতার ত্যাজ্যপুত্র।

যেমন নিঃশব্দে গ্রামে প্রবেশ করেছিলেন, তেমনি নিঃশব্দেই তিনি ফিরে আসছিলেন। কিন্তু যে শিক্ষক তাঁদের দুই ভাইকেই লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন, তিনি তাঁকে পথ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। উইলের তিনি একজন সাক্ষী। তিনি বললেন, বরদাশঙ্কর শিবশঙ্করকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করলেও খানিকটা জায়গা তাঁর জন্যে রেখে গেছেন। উইলে স্পষ্টই উল্লেখ আছে, শিবশঙ্কর যদি জীবিত থাকেন এবং গ্রামে ফিরে আসেন, তা হ'লে ওই জায়গায় বাড়ী ক'রে তিনি বাস করতে পারেন। দিব্যেন্দুশঙ্কর তাতে আপত্তি করতে পারবেন না।

শিবশঙ্কর বিষয়টি নিঃশব্দে ভেবে দেখলেন এবং তাতে সম্মত হলেন।

তাঁদের পৈতৃক প্রাসাদোপম বাড়ীর পরেই একটা মাঠ। তার পাশেই উইলে উল্লিখিত এক বিঘা যায়গা। শিবশঙ্কর জায়গাটি ঘিরে নিয়ে ছোট একখানা একতলা বাড়ী তৈরী করলেন। এবং তারপরে বিবাহও করলেন। তখন তাঁর বয়স চল্লিশ উত্তীর্ণ হয়েছে।

এই বিবাহের কথা বরেন্দ্রশঙ্করেরও স্মরণ আছে।

শিবশঙ্করের কোনো বন্ধু ছিল না। বাল্যের বন্ধুরা কবে তাঁর মন থেকে মুছে গেছে। পৈতৃক রক্তধারাই বলবান। বাল্যের বন্ধুরা এখন আর তাঁর কাছে আসতেও সাহস করে না। দূর থেকে দেখা যায় স্বল্পভাষী, উন্নতদেহ শিবশঙ্কর হয় সম্মুখের বারান্দায় নিঃশব্দে পদচারণা করছেন, নয় তো বাড়ীর পিছনের সব্জির জমি তদারক করছেন।

একথা বোঝা গেল, পৈতৃক জমিদারী থেকে বঞ্চিত হ'লেও শিবশঙ্কর

নিঃস্ব নন। কিন্তু কি পরিমাণ অর্থ কোথা থেকে কিভাবে তিনি উপার্জ্জন ক'রে এনেছেন তাও জানবার সুযোগ কারও হ'ল না।

শিবশঙ্কর গ্রামে ব'সে মহাজনী কারবার আরম্ভ করলেন। সেই সূত্রে গ্রামের এবং গ্রামের বাহিরের লোকও তাঁর কাছে আসতো। কিন্তু আসতো শুধু ঋণ গ্রহণের প্রয়োজনে। নইলে নয়। প্রতিবেশীর সঙ্গে সুরসাল আলোচনা করার অবসর, মন এবং মেজাজ কোনটাই তাঁর ছিল না।

মহাজনী কারবারে লাভ প্রচুর। দেখতে দেখতে শিবশঙ্করের একতলা ছোটবাড়ী দুই পাশে এবং পিছনে প্রসারিত হ'ল, সামনের দিকে লোহার রেলিং এবং জমকালো ফটক হ'ল এবং আরও কিছুদিন পরে দোতালাও উঠলো।

শিবশঙ্করের গৃহিণী দশ বৎসরের দাম্পত্য জীবনে এই পর্য্যন্তই দেখে গিয়েছিলেন। এই পারিবারিক কারাগারে বাইরের মহিলাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার পথে তাঁর বাধা ছিল অনেক। সুতরাং স্বামীর কাছ থেকে কি তিনি পেয়েছিলেন সে কথা কেউ জানে না। তিনি কোনো সন্তান রেখে যাননি।

স্ত্রীর মৃত্যুর পরেও শিবশঙ্করের জীবনে কোনো পরিবর্ত্তন এলো না। টাকা ধার দেওয়া, সুদ গুণে নেওয়া, হিসাব-নিকাশ, সব্জির ক্ষেত এবং সুমুখের বারান্দায় একাকী নিঃশব্দে পদচারণা।

পরিবর্ত্তন যা এলো তা বাইরের।

বাপ-মায়ের অত্যধিক আদরে পরিবর্দ্ধিত, অলস ও বিলাসী দিব্যেন্দুশঙ্কর জমিদারী পরিচালনায় একেবারেই অযোগ্য ছিলেন। বস্তুত অমিতব্যয়িতা ছাড়া দম্ভ করবার আর বিশেষ কিছুই তাঁর ছিল না।

তার ফল যা হবার তাই হ'ল।

অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি প্রচুর ঋণভারে জর্জ্জরিত হলেন। মহাজনের তাগাদায় আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত বিষাক্ত হয়ে উঠলো। মৃত্যুর পূর্ব্বেই তিনি জেনে গেলেন, একমাত্র পুত্র বরেন্দ্রশঙ্করের মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থান ছাড়া আর কিছুই রইলো না। কেবল জানতে পারলেন না, কি যাদুমন্ত্রে সেই সম্পত্তি শিবশঙ্করের হস্তগত হ'ল। উভয়ের মধ্যে বাক্যালাপ দূরের কথা, কখনও সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত হয়নি। তাঁর কাছ থেকে দিব্যেন্দুশঙ্কর কখনও একটি পয়সাও ঋণ গ্রহণ করেননি।

অথচ বিস্ময়কর হ'লেও অত্যন্ত সহজভাবেই তা সত্য হ'ল।

আঠারো-উনিশ বৎসর বয়সে পিতৃগৃহ ত্যাগ করার পরে একটি দিনের জন্যেও শিবশঙ্কর সেখানে পদার্পণ করেননি। দিব্যেন্দুশঙ্করের মৃত্যুকালেও না।

ব্যতিক্রম হ'ল দিব্যেন্দুশঙ্করের শ্রাদ্ধ-দিবসে। সকলকে সচকিত ক'রে অত্যন্ত অতর্কিতে এবং নিঃশব্দে তিনি শ্রাদ্ধসভায় উপস্থিত হলেন। সকলে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালো। শিবশঙ্কর ইঙ্গিতে তাদের বস্‌তে বললেন। কিন্তু নিজে বসলেন না। এক বিন্দু জলও গ্রহণ করলেন না। কয়েক মিনিট নিঃশব্দে শ্রাদ্ধমণ্ডপের দিকে চেয়ে থেকে আবার বেরিয়ে গেলেন।

পিতৃগৃহ ত্যাগ করার পর এই তাঁর সেখানে প্রথম ও শেষ প্রবেশ।

তারপরেও কিছুকাল কেটে গেল।

দুই গৃহের মধ্যে এমন একটি অলঙ্ঘ্য এবং উত্তেজনা-বিহীন ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছিল যে, দিব্যেন্দুশঙ্করের মৃত্যুর পরেও তা তিরোহিত হ'ল না।

বিষয়-সম্পত্তির আর বিশেষ কিছু ছিল না। সুতরাং বরেন্দ্রশঙ্করকে চাকুরীর অন্বেষণে বাইরে যেতে হ'ল। বাড়ীতে রইল তার স্ত্রী এবং শিশুপুত্র।

ক'লকাতা দূরে নয়। বরেন্দ্র শনিবারে আফিস শেষে বাড়ী আসে। রবিবার থাকে। আবার সোমবারে চ'লে যায়। একক শিবশঙ্কর প্রবল প্রতাপে জমিদারী এবং মহাজনী চালান। উভয়ের মধ্যে কখনও দেখা হয় না। কুশল-প্রশ্ন বিনিময়ের অবকাশও হয় না।

এমনি ক'রেই দিন চলছিলো।

সেবারে শনিবারে বাড়ী ফিরে বরেন্দ্র রাত্রে যখন খেতে বসেছে, স্ত্রী অপর্ণা বললে, জ্যাঠামশায়ের অসুখ বেশী।

অপর্ণার এক জ্যাঠামশাই অনেক দিন থেকেই ভুগছিলেন।

বরেন্দ্র নির্লিপ্তভাবে জিজ্ঞাসা করলে, কবে চিঠি এলো ?

অপর্ণা সবিস্ময়ে বললে, চিঠি কি গো ? পাশের বাড়ী থেকে জ্যাঠামশায়ের খবর কি ডাকে আসবে ?

এবার বরেন্দ্রও বিস্মিত হ'ল।

বললে, পাশের বাড়ী কি বলছ ? তিনি ভাগলপুরে থাকেন না ?

অপর্ণা স্বামীর ভুল বুঝতে পারলে।

বললে, আমার জ্যাঠামশাই নয়, তোমার জ্যাঠামশাই। শহর থেকে ডাক্তার এসেছেন। বলেছেন, বাঁচবার আশা নাকি কমই।

বরেন্দ্র শুধু বললে, ও।

—তোমার একবার দেখতে যাওয়া উচিত।

—আমার ? কি দুঃখে ?

—পর তো নয়। নিজের জ্যাঠামশাই।

—হাঁ। যিনি ছেলেবেলায় বাবাকে খুন করতে গিয়েছিলেন। বাবার

মৃত্যুশয্যায় একবার দেখতে আসেননি। শ্রাদ্ধের দিনে একবার এলেন বটে, কিন্তু জলগ্রহণ করেননি। এসব আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না।

অপর্ণা চুপ ক'রে রইল। কিন্তু শোবার সময় কথাটা আর একবার পারলে।

বললে, কিন্তু দেখ, তুমি ছাড়া আর ওঁর কে আছে? তুমিই ওঁর শ্রাদ্ধাধিকারী। সম্পত্তির অধিকারীও তুমি। ওঁর তো ছেলে নেই।

বরেন্দ্র শান্তকণ্ঠে বললে, সেই জন্যেই আরও আমি যেতে পারি না অপর্ণা। উনি হয়তো ভাববেন, জীবনে কোনোদিন ওঁর বাড়ীর ফটক পার হ'লাম না, এখন মৃত্যুকালে সম্পত্তির লোভে এসে হাজির হয়েছি। রায় বংশের ছেলের পক্ষে সে হীনতা স্বীকার সম্ভব নয়।

অপর্ণা আর জেদ করলে না।

রায় বংশকে সে জানে। বরেন্দ্রকে সে চেনে। শিবশঙ্করের মৃত্যুর পূর্ব্বে সে যে ও-বাড়ীর ফটক পার হতে পারে না, সে বিষয়েও তার সংশয় নেই। কিন্তু মৃত্যুশয্যাশায়ী যে বৃদ্ধ পাশের বিরাট অট্টালিকায় স্বজন-বান্ধবহীন অসহায় অবস্থায় একাকী অবস্থান করছেন, তিনি যে বরেন্দ্রের নিজের জ্যাঠামহাশয়, এ কথা ভেবে তার নারীহৃদয় কিছুতেই স্বস্তি বোধ করতে পারলে না।

সোমবার সকালের ট্রেনে বরেন্দ্র ক'লকাতা চলে গেল।

দুপুরে অপর্ণা ঝিকে দিয়ে খবর পাঠালে, সে জ্যাঠামশাইকে দেখতে যাবে। তার একটু পরেই পুত্র অবনীশঙ্করকে কোলে ক'রে ঝি

এবং তার পিছনে অপর্ণা লতাগুল্ম পরিবেষ্টিত মাঠটুকু অতিক্রম ক'রে খিড়কির দরজায় উপস্থিত হ'ল।

দরজা খোলাই ছিল। ঝি সসম্ভ্রমে তাদের ভিতরে নিয়ে এল।

শিবশঙ্করকে অপর্ণা জীবনে একবার মাত্র দেখেছে। দিব্যেন্দুশঙ্করের শ্রাদ্ধের সময়। কিন্তু কখনও কথা বলেনি। শুনেছে, অত্যন্ত রাশভারী এবং কঠোর প্রকৃতির লোক। এ সম্বন্ধে কারও মনে মতদ্বৈধ নাই। তাঁর প্রশস্ত শোবার ঘরের সামনে এসে একবার ভয়ে সে থমকে দাঁড়ালো। কিন্তু তখনই সে ভয় দূর হ'ল।

মস্ত বড় একখানা খাটে দেওয়ালের দিকে মুখ ক'রে শিবশঙ্কর শুয়েছিলেন। পদশব্দে মুখ ফিরিয়ে বললেন, বৌমা! এসো, এসো।

অপর্ণা নম্রভাবে তাঁর পায়ের তলার দিকে এসে দাঁড়ালো।

ঝি বাইরে থেকেই অবনীকে নামিয়ে দিয়েছিল। 'এসো, এসো' শব্দ তার কানে গিয়েছিল। সে সটান্ এসে শিবশঙ্করের মুখের কাছে দাঁড়ালো।

মাথা নেড়ে বললে, কি বল?

শিবশঙ্কর একেবারে উল্লসিত হয়ে উঠলেন। খপ ক'রে ওর ফুলের মতো নরম ছোট্ট হাতখানি ধ'রে বললেন, কিছুই বলিনি ভাই। শুধু খুঁজছিলাম, তুমি আসছ না কেন?

—এই তো এলাম। আবার কোথায় আসব? তোমার্ বিছানার ওপরে?

—হ্যাঁ, নইলে ভালো লাগবে কেন?

—বকবে না তো?

—তোমাকে বকি এত বড় সাহস আমার নেই। শুনছ বৌমা, কি বলে তোমার ছেলে?

অপর্ণা লজ্জিতভাবে বললে, ও ভারি দুষ্টু।

শিবশঙ্কর হেসে বললে, হবে না? রায় বংশের ছেলে দুষ্টু না হ'লে মানাবে কেন? তোমাকে বলি শোনো। একেই আমি খুঁজছিলাম। মানে, আমাকে এসে যে 'তুমি' বলতে পারে—তাকে। এতদিন পরে সেই লোককে পেলাম। আমার আর কোনো দুশ্চিন্তা রইলো না। কিন্তু তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন বৌমা?

এ বাড়ীর ঝি তাড়াতাড়ি একটা আসন আনছিলো।

শিবশঙ্কর বিরক্তভাবে বললেন, আসন কি হবে? তুমি আমার কাছে এসে বোসো বৌমা।

অপর্ণা আর সঙ্কোচ মাত্র করলে না। ওঁর মাথার শিয়রে ব'সে বড় বড় পাকা চুলে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। সে স্পর্শে শিবশঙ্করের চোখ বন্ধ হয়ে এল।

মনে হ'ল অস্ফুট স্বরে একবার যেন বললেন, আঃ!

একটু পরেই ঘুমিয়ে গেলেন।

ঝি এসে সন্তর্পণে অবনীকে নিয়ে গেল। পাছে ওঁর ঘুমের ব্যাঘাত হয়।

এ বাড়ীর ঝি চুপি চুপি এসে বললে, আজ সাতদিন অসুখ হয়েছে, একটিবার চোখের পাতা বোঁজেননি। এতক্ষণে ঘুমুলেন।

বৃহস্পতিবারে অসুখটা বাড়াবাড়িতে দাঁড়ালো।

শহরের ডাক্তার তো রয়েছেনই। তা ছাড়া আরও একজন বড় ডাক্তার এলেন। বরেন্দ্রের কাছে টেলিগ্রামও গেল। কিন্তু সে বিশেষ গ্রাহ্য করলে না।

শনিবারের দিন যথারীতি বাড়ী এসে দেখলে কেউ নেই। ঝিকে জিজ্ঞাসা করলে, এরা কোথায় ?

—বৌমা তো সেই সোমবার থেকে ও বাড়ীতে।

—কোন্ বাড়ীতে ?

—ও বাড়ীতে। খবর দেবো ?

—কেমন আছেন উনি ?

—বড্ড বাড়াবাড়ী হয়েছিল। শুক্রবার সকাল থেকে একটু ভালো আছেন। খবর দোব ?

কি ভেবে বরেন্দ্র বললে, না থাক। আমিই যাচ্ছি।

ও বাড়ীতে গিয়ে দেখে, শিবশঙ্কর খাটের বাজুতে ঠেস দিয়ে অর্দ্ধশায়িত। তাঁর সামনে অবনী। একটা মোটর গাড়ী নিয়ে দু'জনে খেলা হচ্ছে।

বরেন্দ্রকে তিনি দেখতে পাননি।

অবনী একবার বাবার দিকে চেয়ে ইসারায় বললে, দাদু !

এতক্ষণে শিবশঙ্কর পিছন ফিরে চাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার ললাটে ভ্রূকুটি রেখা ফুটে উঠলো।

বরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলে, কেমন আছেন ?

শিবশঙ্কর সংক্ষেপে বলিলেন, ভালো।

বরেন্দ্র কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে বললে, আসবি অবনী ?

অবনীর মোটরগাড়ীটা চলছিলো না। বিরক্তভাবে বললে, না, তুমি যাও।

তারপরে শিবশঙ্করকে একটা ঠেলা দিয়ে বললে, গাড়ীটা চলছে না যে, দাদু। তুমি দাও না চালিয়ে।

শিবশঙ্কর মোটরগাড়ীটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

বললেন, চলবে বৈকি ভাই। মোটরগাড়ী বন্ধ হ'লে কি চলে? এই তো চলছে।

বরেন্দ্র চলে আসবে এমন সময় দেখে ওদিকের দরজা দিয়ে অপর্ণা দুধের বাটী আঁচলে ধরে সন্তর্পণে আসছে।

ওকে দেখে অপর্ণা থমকে দাঁড়ালো। সহাস্তে ইসারায় বললে, তুমি চল, আমি যাচ্ছি।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা